

বিদর্শন ভূমি ও মার্গ ভাবনা



ভদন্ত দীপালোক ভিক্ষু
ভদন্ত শাক্যজ্যোতি ভিক্ষু



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

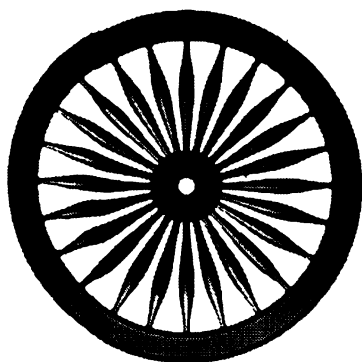
কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Dayamitra Bhante

বিদর্শন ভূমি ও মার্গ ভাবনা

বিদর্শন ভূমি ও মার্গ ভাবনা



ভদন্ত দীপালোক ভিক্ষু
ভদন্ত শাক্যজ্যোতি ভিক্ষু

বিদর্শন ভূমি ও মার্গ ভাবনা

গ্রন্থকারদ্বয়

ভদন্ত দীপালোক ভিক্ষু
ভদন্ত শাক্যজ্যোতি ভিক্ষু

প্রকাশকাল

শুভ মধু পূর্ণিমা
৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ
১৪২১ বঙ্গাব্দ, ২৫৫৮ বুদ্ধাব্দ

প্রকাশক

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ

গ্রন্থ সংশোধনে

ভদন্ত আলোকাবংশ ভিক্ষু

গ্রন্থস্বত্ব

গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজ

ভদন্ত দীপালোক ভিক্ষু

প্রচ্ছদ

ভদন্ত লোকাবংশ ভিক্ষু

মুদ্রণ

ডিজাইন ডট কম
উপজেলা গেইট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১২ ৫৯৪৩২৭

উৎসর্গ

যাঁর ছায়া তলে আশ্রয়
নিয়ে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনে
সম্যক্ প্রয়াস লাভ করে পুলকিত ও বিমুক্ত হয়েছি,
আমাদের সে পরম কল্যাণমিত্র বিদর্শন ভাবনাচার্য
পূজনীয় ভদন্ত উঃ পঞ্ঞদীপ থের মহোদয়
ভান্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা পূজা স্বরূপ অত্র
“বিদর্শন ভূমি ও মার্গ ভাবনা”
গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হল ।

প্রণতঃ
দীপালোক ভিক্ষু
শাক্যজ্যোতি ভিক্ষু

নিবেদন

মানুষ মাত্রই সুখাকাজী। সুখ চায় না বা কামনা করে না এমন সত্ত্ব ত্রি-লোকে নাই। সুখের জন্য মানুষ কি না করে থাকে! সুখ মনুষ্যগণের সর্বোত্তম প্রিয় ও কাম্য বস্তু আর অন্যদিকে দুঃখ মনুষ্যগণের সবচাইতে অপ্রিয় ও ঘৃণ্য বস্তু। চলার পথে মানুষ সুখ নিয়েই বাটতে চায়, দুঃখকে নিয়ে নয়। এজন্য সুখ ও দুঃখ নিয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনার অন্ত নাই। কিন্তু এতটা সত্ত্বেও মানুষ কি আসলেই সুখী হতে পারে? উত্তর হয়তো হতে পারে - “না”। এই “না” অর্থটি গভীরভাবে চিন্তা করে খুঁটিয়ে দেখা দরকার। মানুষ সুখ চাই বটে, কিন্তু মানুষ অন্ধভাবে সুখ চাই - জ্ঞান দিয়ে নয়। আর অপরপক্ষে মানুষ দুঃখকে ভয় করে, কিন্তু দুঃখ মুক্তির জন্য সম্যক্ প্রচেষ্টা করে না। যাহোক, বুদ্ধের মতে যাকে বহন করে আমরা জন্ম-জন্মান্তরে ত্রি-লোকে জন্ম-মৃত্যুর সংসরণ গতিকে অভিবৃদ্ধি করছি, সেটা হলঃ এই নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধ। বুদ্ধ এককথায় বলে দিয়েছেন, “ভারো হবে পঞ্চস্কন্ধো” অর্থাৎ, এই ‘নাম-রূপ’ পঞ্চস্কন্ধ দুঃখময় ভার বা বোঝা সদৃশ। বুদ্ধ আরো বলেছেন, “নখি খন্ধা সম দুক্খ” অর্থাৎ এই নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের মত দুঃখ নাই। সুতরাং বুদ্ধের কথামতে আমরা জন্ম-জন্মান্তরে যে স্কন্ধ বহন করে আসছি, সেটা দুঃখ ভার বা দুঃখের বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে জন্য মানুষ এত দুঃখের ভার বহন করতে না পারায় - সুখের জন্য এত মত্ততা, এত সুখান্ধতা। কিন্তু, সবচাইতে দুঃখের কথা হলঃ দুরারোগ্য রোগের উপশমের জন্য যে রোগের সে ঔষধ সেবন বা চিকিৎসা না করে ভুল বশতঃ তার বিপরীত ঔষধ সেবন বা চিকিৎসা করার কারণে দুরারোগ্য রোগের আরো দ্বি-গুণ বৃদ্ধি

পাওয়ার ন্যায় সত্ত্ব-জীবগণও দুরারোগ্য রোগ সদৃশ এই স্কন্ধ থেকে চির মুক্তি বা চির নিবৃত্তি লাভ করা যায় এমন মার্গ বা পথানুসারী না হয়ে হীন, গ্রাম্য, তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় কাম সুখে রমিত হয়ে আরো স্কন্ধ দুঃখকে বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি করে থাকে। সে কারণে বুদ্ধের স্পষ্ট অভিভাষণ হলঃ

দুঃখং তেভূমকং বট্টং
তণ্হা সমুদযো ভবে,
নিরোধ নাম নিব্বাণং
মগ্গেগা লোকুত্তরো মতো ।

অর্থাৎ কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক এই ত্রি-লোকে পঞ্চস্কন্ধকে নিয়ে পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করা অত্যন্ত দুঃখ দায়ক; ত্রি-লোকে পুনঃপুনঃ দুঃখ স্কন্ধ নাম-রূপকে জন্মগ্রহণ করার বা উৎপত্তি করার মূল জনক হল সমুদয় সত্য ‘তৃষ্ণা’। দুঃখ সত্যের জনক সমুদয় সত্য তৃষ্ণার সমূল নিরোধ বা নিবৃত্তিকেই নিরোধ সত্য নির্বাণ বলে এবং দুঃখ সত্যকে দর্শন করার, সমুদয় সত্যকে সমূলে গ্রহণ করার, নিরোধ সত্য নির্বাণকে অধিগত করার জন্য সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মার্গ বা উপায় হল অষ্টাঙ্গিক মার্গ। সেহেতু অষ্টাঙ্গিক মার্গের পরিপূর্ণতাকে “লোকুত্তর” বলা হয়।

মূলতঃ অত্র “বিদর্শন ভূমি ও মার্গ ভাবনা” গ্রন্থটি বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনকারী যোগীগণের প্রতি দৃষ্টি রেখেই রচনা করা হয়েছে। আমরা আশ্রয় চেষ্টা করেছি, বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের উপর একটি উপাদেয় ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সাধক/সাধিকাগণকে উপহার দিতে। জানিনা এই গ্রন্থটি তাদের ভাবনা অনুশীলনে কতটা গুরুত্ব ও সহায়তা পাবে। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভাবনা অনুশীলন কারীদের জন্য অত্র গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে যে সকল গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি, সে সকল বিজ্ঞ লেখকগণকে শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অত্র গ্রন্থটির প্রুফ সংশোধনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও মঙ্গলকামী শ্রদ্ধেয় আলোকাবংশ ভাস্তে। আর এই গ্রন্থটি রচনা ও

প্রকাশনা করতে গিয়ে যাদের কাছ থেকে অকৃত্রিম সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ লাভ করেছি - আমার অত্যন্ত হিতকামী শ্রদ্ধেয় লোকবংশ ভাণ্ডে, শ্রদ্ধাভাজন সান্দির্টিকা ভাণ্ডে, স্নেহভাজন আনাসাবা ভিক্ষু, শাসনরক্ষিত ভিক্ষু সহ আমি সকলের প্রতি বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যিনি শত ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে আমার একান্ত প্রার্থনায় অত্র গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থটির মান ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছেন, অংকুরীঘোনা জেতবনারাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ, মদীয় পালি শিক্ষা গুরু শ্রদ্ধেয় সত্যপাল থের মহোদয় ভাণ্ডের প্রতিও আমার বিনম্র বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, যে সকল শাসনহিতকামী শ্রদ্ধাবান উপাসক/উপাসিকা অত্র গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আর্থিক শ্রদ্ধাদান দিয়েছেন সেই সকল দাতাগণকে কৃতজ্ঞতা ও মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে স্মরণ করছি এবং এর পুণ্যের ফলে দাতাগণের নিরোগ, দীর্ঘায়ু ও ধর্মময় জীবন সহ নির্বাণ লাভের হেতু হোক - এরূপ মঙ্গল কামনা করছি।

“জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক।”

ইতি

দীপালোক ভিক্ষু

শাক্যজ্যোতি ভিক্ষু

ভূমিকা

উদ্যম, উৎসাহ ও ইচ্ছা শক্তি একজন ব্যক্তির জীবনকে পুরোপুরি পাল্টিয়ে দিতে পারে। পরিণত করতে পারে সাধারণ ব্যক্তি থেকে অসাধারণ ব্যক্তিতে। এজগতে যত লেখক, গবেষক ও আবিষ্কারক হয়েছেন, সকলে ইচ্ছা শক্তির উপর নির্ভর করে, উৎসাহ, উদ্যমশীলের মাধ্যমে। জগৎ শাস্তা তথাগত সম্যক্ সম্মুদ্র ও উদ্যম, উৎসাহ ও উদ্দীপনার দ্বারা নিজেকে বুদ্ধাসনে আসীন করেছিলেন। তিনি বলেছেন— “তুমহেহি কিচ্ছং আতপ্পং অক্খতরো তথাগতা” অর্থাৎ তোমাদেরকেই উদ্যমশীল হতে হবে, তথাগতগণ পথ প্রদর্শক মাত্র।

স্নেহের দীপালোক ভিক্ষু ও শাক্যজ্যোতি ভিক্ষু নিরলস, উদ্যমশীল সম্পন্ন। “বিদর্শন ভূমি ও মার্গ ভাবনা” বইটি এরই ফসল। গত পুরো বছরটি শারীরিক অসুস্থতায় অতিবাহিত হলো আমার। এরপর হতে লেখা-পড়ার ইচ্ছা একেবারে শূন্য কোটায়। স্নেহের ভিক্ষুদ্বয়ের যৌথ রচিত “বিদর্শন ভূমি ও মার্গ ভাবনা”র বই এর ভূমিকা লেখার অনুরোধ আমি না করতে পারলাম না দায়িত্ববোধের কারণে। একেতো ইচ্ছাশক্তি কম, অন্যদিকে অনভিজ্ঞতা। তাছাড়াও এ বর্ষাবাসে ব্যস্ততা বেড়েছে বৈ কি! এসব কিছু সত্ত্বেও দায়িত্ব-জ্ঞানে ভূমিকা লিখতে অগ্রসর হচ্ছি।

‘বি+দর্শন’ বি উপসর্গটি দর্শন-এর সংযোগে বিদর্শন শব্দ গঠিত হয়েছে। ‘বি’ অর্থ বিশেষভাবে আর দর্শন অর্থ দেখা, এ দুটি শব্দ সমন্বয়ে বিদর্শন-এর অর্থ দাঁড়ায় বিশেষভাবে দেখা। কাকে বিশেষভাবে দেখা? সত্যকে সত্যরূপে দেখা আর মিথ্যাকে মিথ্যারূপে দেখা। “সারঞ্চ সারতো ঐত্ত্বা, অসারঞ্চ অসারতো” অর্থাৎ “সার বা যথার্থকে, সার বা যথার্থরূপে জান; অসার বা মিথ্যাকে অসার বা মিথ্যারূপে জান”। প্রাচীনেরা বলেছিলেন—

বিদর্শন বই-এ চতুরায্য সত্য উদয় পর্বে মার্গ সত্য উৎপত্তি কিয়দাংশ এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। পাঠকগণ! এ অংশটা পাঠ করলে Practical বিদর্শন ভাবনায় “গুরু” রূপে আপনারা প্রতিভাত হবেন। তার সাথে মার্গ ভাবনা সুস্পষ্টরূপে অভিজ্ঞ লাভ করবেন।

ভান্তে বলেন- উৎপত্তিটাকে যে জানে বা দর্শন করে তা হল মার্গ জ্ঞান বা মার্গ সত্য। মনে রাখতে হবে- ‘ক্ষুধা’ হচ্ছে দুঃখ সত্য। ক্ষুধা হচ্ছে বা হওয়াটাকে যে জানে তা হল ‘মার্গ সত্য বা মার্গ জ্ঞান’। খাওয়ার ইচ্ছাটা হল- ‘সমুদয় সত্য বা কারণ সত্য’। খাওয়ার ইচ্ছাটাকে যে দর্শন করে বা জানে তা হল ‘মার্গসত্য বা মার্গ জ্ঞান’। আরও সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য বলছি- খাওয়ার জিনিসটা হচ্ছে- বস্তু। এ বস্তু কোথায় অভাব হয়েছে?- শরীরে। শরীরটা কি স্কন্ধ?- রূপস্কন্ধ। আর খাওয়ার বস্তুটা কি?- রূপস্কন্ধ। তাহলে বুঝা যাচ্ছে এক রূপস্কন্ধের প্রয়োজন হচ্ছে অন্য আর এক রূপস্কন্ধের। এটাকে আমরা ক্ষুধা বলছি। আমরা যে রূপস্কন্ধ বলছি তা কি সত্য?- দুঃখ সত্য। মাটি, জল, বায়ু, তাপ এগুলো রূপস্কন্ধ, পঞ্চস্কন্ধের একটি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, এগুলো নামস্কন্ধ। চিন্তা-চৈতসিক বলে এদেরকে। চিন্তা-চৈতসিক বা নামস্কন্ধ গুলো এক সাথে দু’টা উৎপন্ন হতে পারে না। ক্ষিধের উৎপত্তিকালে জানা জ্ঞানটা উৎপন্ন হতে পারে না। যখন জানা জ্ঞানটা উৎপন্ন হয় তখন ক্ষিধে আর থাকে না। কারণ ক্ষিধেটা বিনাশের পর জানা জ্ঞানটা তার স্থান দখল করেছে বলে। এ জ্ঞানটাকে ‘মার্গ সত্য বা মার্গ জ্ঞান’ বলে। তার মানে দুঃখ সত্য বিনাশের পর ‘মার্গ সত্য’ উৎপন্ন হয়। মার্গ জ্ঞানের কারণে দুঃখ সত্য উৎপন্ন হবার সুযোগ পায় না। এর অর্থ হল দুঃখ নিরোধ। যখন দুঃখ সত্য আর উৎপন্ন হতে পারবে না তখন তাকে দুঃখ নিরোধ বলে জানবেন। ‘মার্গ জ্ঞান’ এটাও জানতে পারে যে, দুঃখ সত্য আর উৎপন্ন হবে না। তখন এটাকে দুঃখ নিরোধ সত্য বলে। এভাবে চতুরায্য সত্য সবটাই এসে যাবে। চতুরায্য সত্য যখন সম্পূর্ণভাবে ভাবিত হবে তখন নিরোধ দেখতে পাবেন। নিরোধ সত্য স্থায়ী হলে নির্বাণ লাভ হল।

আলম্বন ও দ্বার-এ দু'টা হচ্ছে- রূপধর্মী বা রূপস্কন্ধ। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান হচ্ছে- নামধর্মী বা নামস্কন্ধ। আলম্বন ও দ্বার হচ্ছে- কারণ এবং নাম স্কন্ধ চার প্রকার হচ্ছে- ফল। অর্থাৎ কার্য ও কারণ। তার মানে প্রতীত্যসমুৎপাদ। কারণ দু'প্রকার হচ্ছে- প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং ফল চার প্রকার হচ্ছে- প্রতীত্যসমুৎপন্ন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে 'কারণ ও ফল' দু'টাই আছে। এটাকে কার্য-কারণ বা হেতু ও ফল বলা হয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে- পঞ্চস্কন্ধের উদয়-বিলয়কে সম্যকরূপে দর্শন বা জানাই বিদর্শন। 'উদয়-বিলয়, বিলয়-উদয়' উৎপত্তি হলে বিলয় আর বিলয় হলে উৎপত্তি হবেই। এটা স্বভাবধর্মী। তাই এ বিলয় বা বিনাশকে জ্ঞান দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করার নাম- মার্গ। এরূপ বিলয় বা বিনাশকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করতে থাকলে উৎপত্তি হবার শক্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে নিঃশেষ হওতঃ আর উদয় বা উৎপত্তি হবার শক্তি একেবারে রহিত হয়। এর নাম- মার্গ ভাবনা। হয়তো এরূপ চিন্তা করে গ্রন্থকারগণ বইয়ের নাম করণ করেছে- "বিদর্শন ভূমি ও মার্গ ভাবনা"।

এ গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে- স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, আর্য়সত্য এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মই প্রজ্ঞা বা মার্গ ভাবনা। তন্মধ্যে স্কন্ধ-রূপাদি ভেদে পঞ্চস্কন্ধ, আয়তন-চক্ষু-আয়তনাদি ভেদে দ্বাদশ আয়তন, ধাতু-চক্ষু-ধাতু আদি অষ্টাদশ ধাতু, আর্য়সত্য- দুঃখ আর্য়সত্যাদি ভেদে চতুরায্য সত্য এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্ম বা কার্যকারণ নীতি ধর্ম। এগুলি পূর্বে আলোচনা করেছি। বিশেষতঃ এই পারমার্থিক বিষয়গুলি অবলম্বন করে প্রজ্ঞা বা মার্গ ভাবনা করতে হয়। এ অর্থেই তারা বিদর্শন ও মার্গ ভূমি স্বরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে- চিত্তানুপস্সনা ও বেদনানুপস্সনা। সুত্রপিটকে দীর্ঘ নিকায়ের অন্তর্গত মহাসতিপট্টান সূত্রে চারটি অনুপস্সনার মধ্যে দু'টি অনুপস্সনা-চিত্তানুপস্সনা ও বেদনানুপস্সনা। অন্য দুটি হচ্ছে- কায়ানুপস্সনা ও ধর্মানুপস্সনা।

চিন্তেতী'তি চিন্তং অর্থাৎ চিন্তা করে এ অর্থে চিন্ত। গ্রন্থে এরূপ বলা হচ্ছে— 'চিন্তানুপস্সনা' এটা শব্দত্রেয়ে গঠিত একটি বিদর্শনিক শব্দ। যেমন— চিন্ত+অনু+পস্সনা অর্থাৎ 'চিন্ত' আলম্বন গ্রহণ করে, আলম্বন জানে ও আলম্বনে রমিত হয় এ অর্থে। 'অনু' পেছনে বা পছাতে এ অর্থে বুঝানো হয়েছে। আর 'পস্সনা'—এ অর্থে দর্শন করা বা জানা। এক অর্থে বলা যায়— কার্যকারণে উৎপন্ন বিজ্ঞান বা চিন্তকে উদয়ের মুহূর্তে উদয়রূপে আর বিলয়ের মুহূর্তে বিলয়রূপে ও অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্মরূপে পঞ্চাঙ্গমার্গ (সম্যক্ প্রচেষ্ঠা, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি, সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প) দিয়ে দর্শন করা বা জানাই হচ্ছে — 'চিন্তানুপস্সনা'।

মোট চিন্তের সংখ্যা— ৮৯ প্রকার। কিন্তু সব চিন্ত নিজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। নিজের সাথে সম্পর্কিত চিন্ত মাত্র ৪৫ প্রকার। কামাবচর চিন্ত ৫৪ প্রকার। এ চিন্তগুলো কামভূমিতে উৎপন্ন হয়। এই ৫৪ প্রকার চিন্ত থেকে ৮ প্রকার মহাক্রিয়া চিন্ত উৎপন্ন হয়— বুদ্ধ ও অর্হৎদের চিন্ত সন্ততিতে আর ১ প্রকার হসিতুপ্পাদ চিন্ত। মোট ৯ প্রকার চিন্ত বাদ দিলে আর থাকে ৪৫ প্রকার চিন্ত। এই ৪৫ প্রকার চিন্ত ত্রিহেতুক চিন্তে উৎপন্ন হয়। আর দ্বিহেতুক পুদ্গলের ৪ সম্প্রযুক্ত চিন্ত বাদ দিয়ে মাত্র ৪১ প্রকার চিন্ত উৎপন্ন হয়। সম্প্রজ্ঞান চিন্ত অভাব হেতু, দ্বিহেতুক পুদ্গলের পক্ষে মার্গ লাভ সম্ভব হয়ে উঠে না। এ সমস্ত চিন্ত এক সঙ্গে উৎপন্ন হয় না, একটা একটা করে উৎপন্ন হয়। কখনো দু'টা চিন্ত একসাথে উৎপন্ন হয় না। যখন নিজের চিন্ত সন্ততিতে উৎপন্ন হয়, তখন তাকে স্মৃতি-সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে দর্শন করাকে চিন্তানুদর্শন বলে।

বেদনা কি?— বুদ্ধের ভাষায় অনুভূতিকে বেদনা বলে। সুখানুভূতি, দুঃখানুভূতি ও উপেক্ষানুভূতি— এ অনুভূতিত্রয়কে বেদনা বলে। প্রতিত্যসমুৎপাদে আছে 'স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা' অর্থাৎ স্পর্শের কারণে বা সাহায্যে বেদনা। অভিধর্ম পিটকে যমক গ্রন্থে সত্য-যমকে এরূপে প্রশ্ন উত্থাপণ করা হয়েছে— "সর্ববিধ 'বেদনা' কি দুঃখ-সত্য"।— ইয়া

“দুঃখ-‘সত্য’ কি সর্ববিধ-বেদনা”? না, সুখ-বেদনা দুঃখ নহে বটে, কিন্তু দুঃখ-সত্য”। এর তাৎপর্য এ যে, “দুঃখ-সত্য” জাতি এবং সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ সর্ববিধ বেদনা দুঃখ-সত্য শ্রেণী। সর্ববিধ বেদনা অনিত্য-স্বভাব বলে দুঃখ-বিপাকী ও দুঃখ সত্যের সমধর্মী; সুতরাং দুঃখ-সত্যের অন্তর্গত।

বেদনা কখন, কোথায় উৎপন্ন হয়?— স্পর্শ যখন পূর্ববর্তী বা অগ্রবর্তী হয় তখন বেদনার উৎপত্তি হয়। বেদনা চোখকে ভিত্তি করে, কর্ণকে ভিত্তি করে, নাসিকাকে ভিত্তি করে, জিহ্বাকে ভিত্তি করে, কায়কে ভিত্তি করে এবং মনকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয়।

কিভাবে বেদনা নিরোধ হয়?— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন— এ ছয়টি স্থানে উৎপন্ন বেদনাকে উদয়-বিলয় ও অনিত্যরূপে দর্শনে বেদনা নিরোধ হয়।

দশ প্রকার বিদর্শন জ্ঞান পূর্বে আলোচনা করেছি।

শেষ চতুর্থ অধ্যায়-এ নির্বাণ। নির্বাণ দু’প্রকার। যথা— সউপাদিশেষ ও অনুপাদিশেষ নির্বাণ। যা লোকোত্তর বলে পরিগণিত তা চার মার্গ-জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে হয়। এটা চার মার্গের ও চার ফলে আলম্বন এবং ‘বান’ (বন্ধন) নামক তৃষ্ণা হতে বহির্গমন। এটা স্বভাবানুসারে একবিধ।

এছটি আকারে ছোট হতে পারে কিন্তু ধর্মের গূঢ় ও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ এর গভীর। তারপরও গ্রন্থকারগণ অতি সহজভাবে তুলে ধরেছেন। একারণে তারা ধন্যবাদার্থ। এত গভীর তত্ত্বপূর্ণ বিষয়টি সহজভাবে লেখনীতে তুলে ধরার আদৌ সহজ ছিল না। এ গ্রন্থটি চয়ন করতে তাদের অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন হয়েছে। তাদের ধৈর্য্য, সাহস ও শ্রম তখনই স্বার্থকে পরিণত হবে, যদি পাঠকগণ পাঠ করে জীবন সত্যের কিঞ্চিৎ হলেও সন্ধান পান। আমি গ্রন্থকারদ্বয়কে আশীর্বাদ ও সুস্থ দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। তাদের ভবিষ্যৎ জীবন উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ বই বৌদ্ধ সমাজে উপহার দিতে সক্ষম হোক।

পরিশেষে সকলের প্রতি এ কথায় বলবো—

দুশ্চিন্তা এবং ভয় মানুষের জীবনে একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এ পঙ্কিলময় পৃথিবীতে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত কেউ এ দুর্ভাগ্যজনক মানসিক অবস্থা হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্ন ও ভয়সংকুল থেকে পরিত্রাণ যদি কেউ পেতে চায়, তবে নিজের নৈতিকতার উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতার সাধন ব্যতীত আর কোনো বিকল্প নেই। আধুনিক মানব জাতি বেঁচে থাকা ও উপভোগের জন্য এতই ব্যস্ত যে, জীবন সত্য উপলব্ধি করার জন্য তাদের কোনো অবকাশ নেই। আপনি হতে পারেন আধুনিক ব্যস্ত ব্যক্তি। কিন্তু, দিনে অন্তত কিছুটা সময় মূল্যবান বই অধ্যয়ন করবেন, যেগুলো আপনার অন্তরকে আলোড়িত করে, বিবেক জাগ্রত করে। এ অভ্যাস আপনাকে অনেক দুঃখ-বেদনা লাঘব করবে এবং আপনার মনের অশান্তি ভুলে যেতে সহায়ক হয়ে উন্নত মানসিকতার উৎকর্ষ সাধন করবে। নিশ্চয়, আপনার সম্যক্ ধর্ম বা যথার্থ সত্যের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে। যথার্থ সত্যই আসল ধর্ম বা সম্যক্ ধর্ম। যথার্থ সত্যই যদি ধর্ম হয়, তাহলে এ ধর্ম আপনার সুখ-শান্তি ও মঙ্গলের প্রয়োজনে এবং অপর জনের সুখ-শান্তি ও মঙ্গলের প্রয়োজনে। সুতরাং ধর্মকে স্মরণ করা, ধর্মীয় দায়িত্ব ও অনুশীলনের জন্য প্রতিদিন কিছুটা সময় বরাদ্দ রাখা আপনার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আপনার দায়িত্ব পালন করুন এবং অপরকে পালনে সহায়তা করুন। এ আহ্বান রেখে ইতি টানছি।

ইতি

সত্যপাল থের

অধ্যক্ষ

গহিরা অঙ্কুরঘোনা জেতবনারাম বিহার
রাউজান, চট্টগ্রাম।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বক	০১
রূপস্বক	০১
বেদনা স্বক	০৭
সংজ্ঞা স্বক	০৮
সংস্কার স্বক	০৮
বিজ্ঞান স্বক -----	১০
আয়তন	১২
ধাতু	১২
আর্য সত্য -----	১৪
চারি আর্য সত্যের লক্ষণ, রস ও প্রত্যুপস্থান -----	২১
চারি আর্যসত্যের উপমা	২২
প্রতিত্যসমুৎপাদ নীতি -----	২৩
চিন্তানুপস্‌সনা বা চিন্তানুদর্শন	৩৮
বেদনানুপস্‌সনা বা বেদনানুদর্শন -----	৫৪
দশ প্রকার বিদর্শন জ্ঞান	৬৩
নির্বাণ	৬৯

॥ নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসমুদ্রাস্মৈ ॥

স্কন্ধ

‘স্কন্ধ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্ম, চিন্তা, ঋতু ও আহারের দ্বারা যা অতীতে উৎপন্ন হয়েছিল, বর্তমানেও অবিশ্রান্তভাবে উৎপন্ন হচ্ছে এবং অনাগতেও উৎপন্ন হবে; তৎ সমুদয়ে উৎপন্ন ধর্ম সমূহকে দুঃখ পুঞ্জ বলা হয়। আর এই ত্রিকালিক দুঃখ পুঞ্জ বা দুঃখ সমষ্টিকেই ‘স্কন্ধ’ নামে অভিহিত করা হয়।

স্কন্ধ পাঁচ প্রকার :

যথাঃ- ১. রূপস্কন্ধ ২. বেদনাস্কন্ধ ৩. সংজ্ঞাস্কন্ধ ৪. সংস্কারস্কন্ধ এবং ৫. বিজ্ঞানস্কন্ধ।

রূপস্কন্ধ

কর্ম, চিন্তা, ঋতু ও আহারের দ্বারা আমাদের এই দেহ বা শরীর উৎপন্ন, বর্দ্ধিত এবং পরিবর্দ্ধিত। দেহ বা শরীরকে পরমার্থিক ভাষায় ‘রূপস্কন্ধ’ বলা হয়। রূপ কেন বলা হয় এই সম্বন্ধে বুদ্ধ বলেছেন - “কিঞ্চ ভিক্ষাবে রূপং বদেথ? রূপ্ণতীতি খো ভিক্ষবে তস্মা রূপং বুচ্চতি” অর্থাৎ- হে ভিক্ষুগণ! কিসের কারণে রূপ বলা হয়? রূপ বিরূপভাব প্রাপ্ত হয়, বিকারগ্রস্থ হয় বা সদা সর্বদা পরিবর্তন হয় বিধায় সে কারণে ‘রূপ’ বলা হয়।

ভূতরূপ চার প্রকার এবং উৎপাদা বা উৎপন্ন রূপ চব্বিশ প্রকার মোট এই আঠাইশ প্রকার রূপ সমূহই ‘রূপস্কন্ধ’।

চার প্রকার ভূতরূপ :

যথাঃ- ১. পাঠবী ধাতু ২. আপো ধাতু ৩. তেজো ধাতু এবং ৪. বায়ো ধাতু

উক্ত চার প্রকার ভূতরূপের স্বভাব-ধর্মতা আট প্রকার । যেমন ঃ-

১. পাঠবী ধাতুর স্বভাব-ধর্মতা হচ্ছে কঠিনতা ও কোমলতার ভাব ধারণ করা ।

২. আপো ধাতুর স্বভাব-ধর্মতা হচ্ছে - আবদ্ধ করণ ও নিবদ্ধকরণ ভাব ধারণ করা ।

৩. তেজো ধাতুর স্বভাব-ধর্মতা হচ্ছে - উষ্ণতা ও শীতলতার ভাব ধারণ করা ।

৪. বায়ো ধাতুর স্বভাব-ধর্মতা হচ্ছে সংকোচন ও প্রসারণতার ভাব ধারণ করা ।

উপরোক্ত চার প্রকার ভূতরূপ সমূহ একেকটি একেক রকম স্বভাব ধারণ করে বলে তাই এদেরকে ‘ধাতুরূপ’ নামেও অভিহিত করা হয় ।

বস্তুতঃ কর্ম, চিন্ত, ঋতু ও আহারের অনুকূল এবং প্রতিকূলতার কারণেই ভূতরূপ সমূহ ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ধারণ করে থাকে । যেমনঃ কর্ম, চিন্ত, ঋতু ও আহারের প্রতিকূলতার কারণে পাঠবী ধাতুর ‘কঠিনতা’ এবং অনুকূলতার কারণে ‘কোমলতা’র স্বভাব ধারণ করে ইত্যাদি ।

চব্বিশ প্রকার সমুখিত রূপ বর্ণনা

পাঁচ প্রকার প্রসাদ রূপ :

১. চক্ষু প্রসাদরূপ - সসম্ভার চক্ষু গোলকের ঠিক কেন্দ্র স্থানে যে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট উকুণ মস্তিকের ন্যায় রূপ আছে, তাহাই - 'চক্ষু প্রসাদরূপ'। যার দ্বারা দর্শন কার্য সম্পাদিত হয়।

২. শ্রোত্র প্রসাদরূপ - সসম্ভার শ্রোত্রের অভ্যন্তরে অঙ্গুরির অঙ্গুলিকের ন্যায় যে তাম্র বর্ণের সদৃশ লোমের ঠিক সে কেন্দ্র স্থলে যে অতীব সংবেদনীয় রূপ আছে, তাহাই - 'শ্রোত্র প্রসাদরূপ'। যার দ্বারা শ্রবণ কার্য সম্পাদিত হয়।

৩. ঘ্রাণ প্রসাদরূপ - সসম্ভার ঘ্রাণের অভ্যন্তরে অজপদের ন্যায় যে অতীব সংবেদনীয় রূপ আছে, তাহাই - 'ঘ্রাণ প্রসাদরূপ'। যার দ্বারা আঘ্রাণ কার্য সম্পাদিত হয়।

৪. জিহ্বা প্রসাদরূপ - সসম্ভার জিহ্বার কেন্দ্র স্থানে যে পদ্ম ফুলের পাপড়ির ন্যায় অতীব সংবেদনীয় রূপ আছে, তাহাই - 'জিহ্বা প্রসাদরূপ'। যার দ্বারা রসনা কার্য সম্পাদিত হয়।

৫. কায় প্রসাদরূপ - চুল, নখ ও শুষ্ক চর্ম ক্রীত সমস্ত রূপ কায়ে যে কার্পাস তুলার ন্যায় রূপ আছে, তাহাই - 'কায় প্রসাদরূপ'। যার দ্বারা স্পর্শাদি কার্য সম্পাদিত হয়।

চার প্রকার গোচর রূপ :

১. রূপালম্বন - বর্ণ বা যাবতীয় চক্ষেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তুই 'রূপালম্বন'।

২. শব্দালম্বন - কর্ণগ্রাহ্য সমস্ত কর্ণশ ও মধুর আলম্বনই 'শব্দালম্বন'।

চার প্রকার ভূতরূপ :

যথাঃ- ১. পাঠবী ধাতু ২. আপো ধাতু ৩. তেজো ধাতু এবং ৪. বায়ো ধাতু

উক্ত চার প্রকার ভূতরূপের স্বভাব-ধর্মতা আট প্রকার । যেমন ঃ-

১. পাঠবী ধাতুর স্বভাব-ধর্মতা হচ্ছে - কঠিনতা ও কোমলতার ভাব ধারণ করা ।

২. আপো ধাতুর স্বভাব-ধর্মতা হচ্ছে - আবদ্ধ করণ ও নিবদ্ধকরণ ভাব ধারণ করা ।

৩. তেজো ধাতুর স্বভাব-ধর্মতা হচ্ছে - উষ্ণতা ও শীতলতার ভাব ধারণ করা ।

৪. বায়ো ধাতুর স্বভাব-ধর্মতা হচ্ছে সংকোচন ও প্রসারণতার ভাব ধারণ করা ।

উপরোক্ত চার প্রকার ভূতরূপ সমূহ একেকটি একেক রকম স্বভাব ধারণ করে বলে তাই এদেরকে ‘ধাতুরূপ’ নামেও অভিহিত করা হয় ।

বস্তুতঃ কর্ম, চিন্ত, ঋতু ও আহারের অনুকূল এবং প্রতিকূলতার কারণেই ভূতরূপ সমূহ ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ধারণ করে থাকে । যেমনঃ কর্ম, চিন্ত, ঋতু ও আহারের প্রতিকূলতার কারণে পাঠবী ধাতুর ‘কঠিনতা’ এবং অনুকূলতার কারণে ‘কোমলতা’র স্বভাব ধারণ করে ইত্যাদি ।

চব্বিশ প্রকার সমুখিত রূপ বর্ণনা

পাঁচ প্রকার প্রসাদ রূপ :

১. চক্ষু প্রসাদরূপ - সসম্ভার চক্ষু গোলকের ঠিক কেন্দ্র স্থানে যে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট উকুণ মস্তিকের ন্যায় রূপ আছে, তাহাই - 'চক্ষু প্রসাদরূপ'। যার দ্বারা দর্শন কার্য সম্পাদিত হয়।

২. শ্রোত্র প্রসাদরূপ - সসম্ভার শ্রোত্রের অভ্যন্তরে অঙ্গুরির অঙ্গুলিকের ন্যায় যে তাম্র বর্ণের সদৃশ লোমের ঠিক সে কেন্দ্র স্থলে যে অতীব সংবেদনীয় রূপ আছে, তাহাই - 'শ্রোত্র প্রসাদরূপ'। যার দ্বারা শ্রবণ কার্য সম্পাদিত হয়।

৩. ঘ্রাণ প্রসাদরূপ - সসম্ভার ঘ্রাণের অভ্যন্তরে অজপদের ন্যায় যে অতীব সংবেদনীয় রূপ আছে, তাহাই - 'ঘ্রাণ প্রসাদরূপ'। যার দ্বারা আঘ্রাণ কার্য সম্পাদিত হয়।

৪. জিহ্বা প্রসাদরূপ - সসম্ভার জিহ্বার কেন্দ্র স্থানে যে পদ্ম ফুলের পাপড়ির ন্যায় অতীব সংবেদনীয় রূপ আছে, তাহাই - 'জিহ্বা প্রসাদরূপ'। যার দ্বারা রসনা কার্য সম্পাদিত হয়।

৫. কায় প্রসাদরূপ - চুল, নখ ও শুষ্ক চর্ম ব্যতীত সমস্ত রূপ কায়ে যে কার্পাস তুলার ন্যায় রূপ আছে, তাহাই - 'কায় প্রসাদরূপ'। যার দ্বারা স্পর্শাদি কার্য সম্পাদিত হয়।

চার প্রকার গোচর রূপ :

১. রূপালম্বন - বর্ণ বা যাবতীয় চক্ষেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তুই 'রূপালম্বন'।

২. শব্দালম্বন - কর্ণগ্রাহ্য সমস্ত কর্ণশ ও মধুর আলম্বনই 'শব্দালম্বন'।

৩. গন্ধালম্বন - ঘ্রাণগ্রাহ্য সমস্ত সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ আলম্বনই 'গন্ধালম্বন'।

৪. রসালম্বন - জিহ্বাগ্রাহ্য সমস্ত মধুর-তিক্ত ও অম্ল-কষায়াদি আলম্বনই 'রসালম্বন'।

উক্ত চার প্রকার রূপ সমূহ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি আয়তনে আবর্তিত হয়, পতিত হয় বা বিচরণ করে বলেই এদেরকে - 'গোচর রূপ' বলা হয়।

দুই প্রকার ভাব রূপ :

১. স্ত্রী-ভাব রূপ - স্ত্রী জাতির বিবিধ হাব-ভাব, অঙ্গ-ভঙ্গি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা, আকার-আকৃতি সহ স্ত্রী জাতির সুলভ বৈশিষ্ট্যতার গুণকেই 'স্ত্রী-ভাব রূপ' বলা হয়।

২. পুং-ভাব রূপ - পুং (পুরুষ) জাতির বিবিধ হাব-ভাব, অঙ্গ-ভঙ্গি, চাল-চলনাদি সহ ইত্যাদি পুং জাতির সুলভ বৈশিষ্ট্যতার গুণকেই 'পুং-ভাবরূপ' বলা

এক প্রকার হৃদয় রূপ :

১. হৃদয় রূপ - হৃদ্বস্তুর অভ্যন্তরে যে পুন্নাগ-ফুলের কষা প্রমাণ স্বচ্ছ হৃদ্রক্ত বিদ্যমান থাকে, তাহাই 'হৃদয়রূপ'। আর এই হৃদ্রূপকে আশ্রয় করেই মনোধাতু প্রবর্তিত হয়।

এক প্রকার জীবিত রূপ :

১. জীবিত রূপ - যদিওবা এই রূপ-কায় অতীত কর্মের কারণে উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু এই রূপ-কায় জীবিত রূপের অবিদ্যামানে নিষ্প্রাণ ও নিস্তেজ হয়ে যায়। এই জীবিত রূপই চারি মহাভূত রূপকে ভেদ বা বিভাজ্য হতে না দিয়ে সর্বদা অভেদ্য, অবিভাজ্য ও একীভূত করে রূপ-কায়কে বাঁচিয়ে রাখে বা জীবিত রাখে।

এক প্রকার আহার রূপ :

১. আহার রূপ এখানে কবলীকৃত আহারই আহার রূপ। এই কবলীকৃত আহারের পুষ্টির দ্বারাই রূপ-কায় প্রতিপালিত, পরিপোষিত ও বর্দ্ধিত হয়ে থাকে।

এমনকি জীবিত রূপও কবলীকৃত আহারের সাপেক্ষ।

এক প্রকার পরিচ্ছেদ রূপ :

১. পরিচ্ছেদ রূপ - সমস্ত বিষয় বস্তুতে, রূপ কলাপে এবং অণু-পরমাণুতে যে পরস্পরের পৃথকতা, সীমাব্যঞ্জকতা, সচ্ছিন্নতা এবং সমান্তরাল সাধনের বৈশিষ্ট্য গুণ-ধর্মতা উৎপন্ন করে, তাহাই 'পরিচ্ছেদ রূপ'। পরিচ্ছেদ রূপের অন্য নাম 'আকাশ ধাতু' রূপ।

দুই প্রকার বিজ্ঞপ্তি রূপ :

১. কায় বিজ্ঞপ্তি - কায়িক বা দৈহিক ইঙ্গিত বা অঙ্গ-ভঙ্গির দ্বারা যে মনোভাব প্রকাশ করা হয়, তাহাই 'কায় বিজ্ঞপ্তি' রূপ।

২. বাক্য বিজ্ঞপ্তি - বাক্য বা বাচনিক দ্বারা যে মনোভাব ব্যক্ত করা হয়, তাহাই 'বাক্য বিজ্ঞপ্তি' রূপ।

তিন প্রকার বিকার রূপ :

১. লঘুতা - উৎপন্ন রূপের যে হালকা ভাব তাহাই 'লঘুতা রূপ'।

২. মৃদুতা - উৎপন্ন রূপের যে কোমলতা, যথেষ্ট কায় ক্রিয়ার সঞ্চালন শীলতা তাহাই 'মৃদুতা রূপ'।

৩. কর্মণ্যতা - চারি মহাভূত ধাতুর অনুকূল সমন্বয়তার কারণে যে দৈহিক সক্রিয়তা তাহাই - 'কর্মণ্যতা রূপ'।

চার প্রকার লক্ষণ রূপ :

১. উপচয় - রূপের উদয় বা উৎপত্তিকেই 'উপচয় রূপ' বলে।

২. সন্ততি - রূপের উদয়ের পূর্ণতাবস্থা বা মধ্যাবস্থাকেই 'সন্ততি রূপ' বলে।

৩. জরতা - রূপের জরতা বা পতনাবস্থাকেই 'জরতা রূপ' বলে।

৪. অনিত্যতা - রূপের জরতা বা পতনাবস্থার বিনাশ, ভঙ্গুরতা বা মৃত্যুবস্থাকেই 'অনিত্যতা রূপ' বলে।

উপরোক্ত আঠাইশ প্রকার রূপের মধ্যে পাঠবী ধাতু হতে কবলীকৃত আহার রূপ পর্যন্ত মোট এই আঠার প্রকার রূপকে স্বভাব রূপ, স্বলক্ষণ রূপ, নিষ্পন্ন রূপ, রূপারূপ বা সংমর্শন রূপ নামে অভিহিত করা হয়। আর অবশিষ্ট দশ প্রকার রূপ সমূহকে অনিষ্পন্ন রূপ বা আকার-আকৃতি অবস্থা মাত্র রূপ বলা হয়।

চতুর্জ সমুখিত রূপ

১. কর্মজ-রূপ - আট প্রকার অবিনিভাজ্য রূপ, আট প্রকার ইন্দ্রিয় রূপ, এক প্রকার পরিচ্ছেদ রূপ এবং এক প্রকার হৃদবস্তু রূপ- এই আঠার প্রকার রূপই কর্মজ রূপ বা কর্মের কারণে উৎপন্ন রূপ।

উক্ত আঠার প্রকার কর্মজ রূপ সমূহ অতীত কুশলাকুশল কর্মের কারণে প্রতীক্ষা ক্ষণ হতে মৃত্যু ক্ষণ বা চ্যুতিচিহ্ন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে সতের চিত্ত ক্ষণের উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গের প্রতিতি ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয়ে বিনাশ হয়ে থাকে।

২. চিত্তজ-রূপ - আট প্রকার অবিনিভাজ্য রূপ, পাট প্রকার বিকার রূপ, এক প্রকার শব্দ রূপ এবং এক প্রকার পরিচ্ছেদ রূপ এই পনের প্রকার রূপই চিত্তজ রূপ বা চিত্তের কারণে উৎপন্ন রূপ। কর্মজ রূপ সমূহ অতীত কুশলাকুশল কর্মের দ্বারাই উৎপন্ন হয়। কিন্তু, চিত্তজ রূপ সমূহ বর্তমানে চলমান জীবন প্রবাহতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। চার প্রকার অরূপ বিপাক চিত্ত ও দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান সহ এই চৌদ্দ প্রকার চিত্ত ব্যতীত অবশিষ্ট পচাঁত্তর প্রকার চিত্তই ভবাঙ্গ

চিত্তের প্রথম উৎপত্তি ক্ষণ হতে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে চ্যুতি চিত্ত ক্ষণ পর্যন্ত চিত্তজ রূপ উৎপন্ন করে।

৩. ঋতুজ রূপ- আট প্রকার অবিভাজ্য রূপ, একপ্রকার শব্দ রূপ, তিন প্রকার বিকার রূপ এবং এক প্রকার পরিচ্ছেদ রূপ - এই তের প্রকার রূপই ‘ঋতুজ রূপ’। ঋতুজ রূপ সমূহ প্রতীক্ষি চিত্তের স্থিতি ক্ষণ হতে আরম্ভ করে আধ্যাত্মিক ঋতু ও বাহ্যিক ঋতুর অবস্থানুসারে যথাযতভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

৪. আহারজ রূপ - আট প্রকার অবিভাজ্য রূপ, তিন প্রকার বিকার রূপ এবং এক প্রকার পরিচ্ছেদ রূপ এই বার প্রকার রূপই ‘ঋতুজ রূপ’। দেহ রক্ষার্থে যা ভক্ষণ করা হয়, তাহাই আহার। আর ভুক্ত আহার যখন পাকস্থলীতে সুপরিপাক হওয়া শুরু করে তখনই আহারের ওজ বা পুষ্টি দেহে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক সে হতেই আহারজ রূপ সমূহ যথাযতভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

বেদনা স্কন্ধ

বেদনা - এটা মূলতঃ মানসিক অনুভূতি যা দিয়ে সুখ-দুঃখাদি অনুভব করা যায়। বেদনা তিন প্রকার। যথাঃ সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা এবং উপেক্ষা বেদনা। কিন্তু কায়িক ও মানসিক ভেদে বেদনা পাঁচ প্রকার। যেমনঃ সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, উপেক্ষা বেদনা, সৌমনস্য বেদনা এবং দৌর্মনস্য বেদনা। এই পাঁচ প্রকার বেদনাই ‘বেদনা স্কন্ধ’।

উক্ত পাঁচ প্রকার বেদনাকে তিন প্রকার বেদনায়, তিন প্রকার বেদনাকে দুই প্রকার বেদনায় এবং দুই প্রকার বেদনাকে এক প্রকার বেদনায় ভাগ করা যায়। যেমনঃ

১. সুখ বেদনা ও সৌমনস্য বেদনাদ্বয়কে - সুখ বেদনায়।

দুঃখ বেদনা ও দৌর্মনস্য বেদনাদ্বয়কে - দুঃখ বেদনায়।

উপেক্ষা বেদনাকে - উপেক্ষা বেদনায়।

২. সুখ বেদনাকে - সুখ বেদনায় ।

দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনাদ্বয়কে - দুঃখ বেদনায় ।

৩. সুখ বেদনা ও দুঃখ বেদনাদ্বয়কে - দুঃখ বেদনায় ।

উপরোক্ত পাঁচ প্রকার বেদনাকে পরিশেষে এক প্রকার দুঃখ বেদনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । কারণ, সুখ বেদনা ও সৌমনস্য বেদনাদি উদয়ের ক্ষণে যদিও বা সুখ হলেও কিন্তু বিলয়ের ক্ষণে দুঃখভাব ধারণ করে । সেহেতু, সমুদয় বেদনা প্রতিনিয়ত উদয়-বিলয় ও অনিত্যধর্মী বলেই - ‘বেদনা স্কন্ধ দুঃখ’ ।

সংজ্ঞা স্কন্ধ

সংজ্ঞা - বলতে ষড়েন্দ্রিয়ে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় এবং মনে) ষড়ালম্বন (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম) যে যেভাবে পতিত হয়, ঠিক সে সে ভাবে জানাই ‘সংজ্ঞা’ । যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চক্ষু ইন্দ্রিয়ে রূপালম্বন স্বরূপ একজন মহিলার প্রতিচ্ছবি পতিত হল, ঠিক সে মুহূর্তে ইহা একটি মহিলা, সে পুরুষ নয়, মহিলাটি ফর্সা, শ্যামলা বা কালো নয় ইত্যাদি ভেদে যে একটা প্রাথমিক সংজ্ঞানন বা উপলব্ধি জন্মে তাকেই ‘চক্ষুজ রূপ সংজ্ঞা’ বলে । ঠিক অনুরূপভাবে কর্ণজ শব্দ সংজ্ঞা, নাসিকাজ গন্ধ সংজ্ঞা, জিহ্বাজ রস সংজ্ঞা, কায়জ স্পর্শ সংজ্ঞা এবং মনোজ ধর্ম সংজ্ঞা । এই ছয় প্রকার সংজ্ঞাকেই ‘সংজ্ঞা স্কন্ধ’ নামে অভিহিত করা হয় ।

সংস্কার স্কন্ধ

সংস্কার - বলতে ত্রি-দ্বারে যে সমস্ত কর্মাদি সম্পাদিত হয়েছে, সে সে কৃতকর্ম সমূহের বিপাক শক্তি এখনো চিন্তা সন্ততিতে সুপ্তাকারে নিহিত এরূপ কৃতকর্মের সমুদয় বিপাক শক্তিকেই - ‘সংস্কার স্কন্ধ’ বলা হয় ।

ত্রিকাল ভেদে সংস্কার অতীত কালিক। আর এই অতীত কালিক সংস্কারই বর্তমানকে গঠন করেছে। অর্থাৎ বর্তমান নাম রূপকে সম্ভূত হওয়ার জন্য প্রত্যয়ের দ্বারা উপকার করেছে।

সংস্কার, চেতনা এবং কর্ম এই বিষয়ত্রয়কে ত্রি-কালিক কর্ম প্রবাহ বলা হয়। যেমনঃ- যে সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, তাহা 'সংস্কার বা অতীত কর্ম-ভব' আর যখন প্রত্যয়ের কারণে সুপ্ত সংস্কার জাগ্রত হয়, তখন ইহাকে 'চেতনা' বলে এবং জাগ্রত চেতনা যদি কুশলাকুশল ভেদে প্রবর্তিত হয়, তখন তাহা কায় কর্ম, বাক্য কর্ম এবং মনো কর্ম রূপে সম্পাদিত হয়; আর এই ত্রি-দ্বারে কুশলাকুশল কর্ম করাকেই বর্তমান 'কর্ম-ভব' নামে অভিহিত করা হয়।

চেতনা ও কর্মের দ্বারানুসারে সংস্কার ছয় প্রকার :

১. **পুণ্যাভিসংস্কার :** পূর্বে যে ভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদিত হয়েছে, সে সম্পাদিত পুণ্য কর্মের সংস্কার পুনঃ জাগ্রত হয়ে তার হতে অধিক আকারে নতুন ভাবে পুণ্য কর্ম সম্পাদন করা - এই অর্থে পুণ্যাভিসংস্কার।

২. **অপুণ্যাভিসংস্কার :** পূর্বে যে ভাবে অপুণ্য বা অকুশল কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, সে সম্পাদিত অকুশল কর্মের সংস্কার পুনঃ জাগ্রত হয়ে তার চাইতে অধিক আকারে নতুন ভাবে অকুশল কর্ম সম্পাদন করা - এই অর্থে অপুণ্যাভিসংস্কার।

৩. **আনেঞ্জাভিসংস্কার :** অরূপাবচর আকাশাত্মাতন ধ্যানজ প্রথম কুশল চিত্ত উৎপন্ন বা লাভ করার পর পুনঃরায় পূর্ব সে ধ্যানজ সংস্কার জাগ্রত করে নতুন ভাবে পরবর্তীতে বিজ্ঞানায়তন, অকিঞ্চিনায়তনদি অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান লাভ বা উৎপন্ন করার ইচ্ছায় নতুন ভাবে অরূপাবচর ধ্যানাদি কর্মের অনুষ্ঠান করা - এই অর্থে আনেঞ্জাভিসংস্কার।

৪. কায় সংস্কার : কায় দ্বারে কৃত কুশলাকুশল সন্ধিত কর্মের সংস্কার ।

৫. বাক্য সংস্কার : বাক্য দ্বারে কৃত কুশলাকুশল সন্ধিত কর্মের সংস্কার ।

৬. মনোসংস্কার : মনো দ্বারে কৃত কুশলাকুশল সন্ধিত কর্মের সংস্কার ।

বিজ্ঞান স্কন্ধ

‘বিজ্ঞান’ বলতে ৮৯ প্রকার চিত্তের মধ্যে ৮ প্রকার মার্গ ও ফল চিত্ত ব্যতীত অবশিষ্ট ত্রি-ভূমির (কাম ভূমি, রূপ ভূমি ও অরূপ ভূমি) ৮১ প্রকার চিত্ত সমষ্টিকেই ‘বিজ্ঞান স্কন্ধ’ বলা হয় । তন্মধ্যে ১২ প্রকার অকুশল চিত্ত, ১৮ প্রকার অহেতুক চিত্ত, এবং ২৪ প্রকার কুশল চিত্ত - মোট এই ৫৪ প্রকার চিত্তই - কামবচর চিত্ত । ৫ প্রকার ধ্যান চিত্ত, ৫ প্রকার বিপাক চিত্ত ও ৫ প্রকার ক্রিয়া চিত্ত - মোট এই ১৫ প্রকার চিত্ত সমূহই - রূপাবচর চিত্ত । ৪ প্রকার ধ্যান চিত্ত, ৪ প্রকার বিপাক চিত্ত ও ৪ প্রকার ক্রিয়া চিত্ত মোট এই ১২ প্রকার চিত্তই - অরূপাবচর চিত্ত ।

বিঃ দ্রঃ ১৮ প্রকার অহেতুক বিপাক চিত্তের ৩ প্রকার ক্রিয়া চিত্তের মধ্যে ১ প্রকার হসিতোৎপাদক চিত্ত, ৮ প্রকার কামবচর ক্রিয়া চিত্ত, ৫ প্রকার রূপাবচর ক্রিয়া চিত্ত এবং ৮ প্রকার অরূপাবচর ক্রিয়া চিত্ত - মোট এই ১৮ প্রকার চিত্ত সমূহ কেবলমাত্র সম্যক্ সমুদ্র, পক্ষেবুদ্ধ ও অরহতগণের মধ্যেই উৎপন্ন হয়ে থাকে ।

পঞ্চস্কন্ধের উপমা

১. “ফেণপিণ্ডো বিয় রূপং” - বলতে ‘রূপ’ ফেন পুঞ্জের মত । যেমন, ফেনা পুঞ্জের সার বস্তু বলতে কিছুই নাই, ঠিক তদ্রূপভাবে রূপ স্কন্ধেও নিত্য, ধ্রুব ও আত্ম নামক কোন সার বস্তু নাই । সেজন্য রূপ স্কন্ধ ও ফেনা পুঞ্জের ন্যায় নিঃসার ।

২. “উদক পুঙ্খলো বিয বেদনা” - অর্থাৎ ‘বেদনা’ জল বুদ্ বুদের ন্যায়। যেমন, জল বুদ্ বুদ্ উৎপন্ন হওয়া মাত্রই নিমিষেই বিনাশ হয়ে যায়; ঠিক অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আয়তনাদির কারণে উৎপন্ন বেদনা সমূহও উৎপন্ন হওয়া মাত্রই বিনাশ হয়ে যায়।

৩. “মরীচিকা বিয সংজ্ঞা” - অর্থাৎ ‘সংজ্ঞা’ বিভ্রান্তকর মরীচিকার ন্যায়। যেমন, পথিকেরা মরুভূমির পথ অতিক্রমের সময় দূর থেকে বালুকারাশি দর্শন করে - আমরা জলপূর্ণ নদী বা একটি বিরাট জলপূর্ণ জলাশয় দেখতে পাচ্ছি বলে দৃষ্টি ভ্রম হওয়ার ন্যায়; সংজ্ঞাও নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের অনিত্যকে নিত্যরূপে, দুঃখকে সুখরূপে, অনাত্মাকে আত্মরূপে ও অশুভকে শুভরূপে সংজ্ঞান বা ধারণা করে প্রতিনিয়ত সত্ত্ব জীবগণকে বিভ্রান্ত করছে।

৪. “কদলিক্ষক্কো বিয সংস্কার” অর্থাৎ ‘সংস্কার’ কদলীবৃক্ষের (কলাগাছের) ন্যায়। যেমন, সারান্বেষী যদি কদলীবৃক্ষের একেকটি বাকল তুলতে তুলতে সমস্ত বাকলও অপসৃত করে, তারপরও তিনি কোন সার লাভ করতে সক্ষম না হওয়ার ন্যায় ত্রি-দ্বারে সম্পাদিত কুশলাকুশল সমস্ত সংস্কার সমূহকে প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দর্শন করলে তখন নিত্য, সুখ, আত্ম ও শুভ সার নামক কোন সারবস্তু পাওয়া যায় না।

৫. “মায়া বিয বিজ্ঞানং” - অর্থাৎ ‘বিজ্ঞান’ মায়ার ন্যায়। মায়া বিদ্যায় পারদর্শী যাদুকর যেমন বিবিধ মায়া বিদ্যার দ্বারা মিথ্যাকে সত্যরূপে, অবাস্তবকে বাস্তবরূপে প্রদর্শনের দ্বারা দর্শকগণকে মোহিত ও প্রবঞ্চিত করে, ঠিক অনুরূপভাবে অবিদ্যা ও তৃষ্ণার পাশাবন্ধ ষড়েন্দ্রিয়জ বিজ্ঞান সমূহও আমি দেখতেছি, আমি শুনতেছি, আমি ঘ্রাণ নিতেছি ইত্যাদি বলে ইহা আমি, ইহা আমার অথবা অনিত্যকে নিত্য, দুঃখকে সুখ ও অনাত্মকে আত্মরূপে জ্ঞাত হয়ে বা জেনে সত্ত্ব জীবগণকে প্রতিনিয়ত মোহিত ও প্রবঞ্চিত করতেছে।

আয়তন

“আযতী’তি আযতনং” - অর্থাৎ সংসার পরিভ্রমণকে সুদীর্ঘভাবে বা বিস্তৃতাকারে সংসরণ (জন-মৃত্যুর প্রবাহ) গতিকে আনায়ন করে অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত করে বলেই ইহাকে ‘আয়তন’ বলা হয়। অন্যার্থে, আয়তনকে কর্ম ক্ষেত্র ও বলা হয়। কারণ, এই আয়তনেই সত্ত্ব বা জীবগণ যাবতীয় কুশলাকুশল কর্মাদি সম্পাদন করে থাকে।

আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক ভেদে আয়তন দ্বাদশ প্রকার। যথাঃ-

আধ্যাত্মিক ছয় আয়তন	বাহ্যিক ছয় আয়তন
১. চক্ষায়তন	১. রূপায়তন
২. শ্রোত্রায়তন	২. শব্দায়তন
৩. ঘ্রাণায়তন	৩. গন্ধায়তন
৪. জিহ্বায়তন	৪. রসায়তন
৫. কায়ায়তন	৫. স্পর্শায়তন
৬. মনায়তন	৬. ধর্মায়তন

উপরোক্ত দ্বাদশ আয়তনকেই ‘আয়তন’ নামে কথিত।

(আরো জানতে প্রতিত্যসমুৎপাদ বর্ণনায় দ্রষ্টব্য)

ধাতু

“আন্তনো সভাবং ধারেতী’তি ধাতুযো” পরমার্থ ধর্ম সমূহ দেব-ব্রহ্মা, ঈশ্বর- সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক পরিচালিত বা সংবর্তিত না হয়ে, স্ব-স্ব ভাব ধারণ করে বলেই এদেরকে ‘ধাতু’ বলা হয়। অথবা পরমার্থ ধর্ম সমূহ স্বীয় ধর্মতা হতে ভিন্নতা হয় না বলেই ‘ধাতু’।

আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক ও উৎপত্তি ভেদে ধাতু মোট আঠার প্রকার। যথাঃ-

আধ্যাত্মিক ধাতু

বাহ্যিক ধাতু

উৎপন্ন ধাতু

১. চক্ষু প্রসাদ ধাতু

১. রূপালম্বন ধাতু

১. চক্ষুবিজ্ঞান ধাতু

২. শ্রোত্র প্রসাদ ধাতু

২. শব্দালম্বন ধাতু

২. শ্রোত্রবিজ্ঞান ধাতু

৩. ঘ্রাণ প্রসাদ ধাতু

৩. গন্ধালম্বন ধাতু

৩. ঘ্রাণবিজ্ঞান ধাতু

৪. জিহ্বা প্রসাদ ধাতু

৪. রসালম্বন ধাতু

৪. জিহ্বাবিজ্ঞান ধাতু

৫. কায় প্রসাদ ধাতু

৫. স্পর্শালম্বন ধাতু

৫. কায়বিজ্ঞান ধাতু

৬. মনো ধাতু

৬. ধর্মালম্বন ধাতু

৬. মনোবিজ্ঞান ধাতু

এখানে, “চক্ষু প্রসাদ ধাতু” বলতে চক্ষু প্রসাদ কেবলমাত্র রূপালম্বনকে দর্শন করে, রূপালম্বন ভিন্ন অন্য কোন আলম্বন দর্শন করার স্বভাব ধারণ করে না বলেই চক্ষু প্রসাদকে - “চক্ষু প্রসাদ ধাতু” বলা হয়।

ঠিক অনুরূপভাবে বাকি আধ্যাত্মিক ধাতু সমূহকেও একইভাবে জানতে হবে।

“রূপালম্বন ধাতু” - বলতে এখানে রূপালম্বন কেবলমাত্র চক্ষু প্রসাদে পতিত হবে বা সংস্পর্শিত হবে; রূপালম্বন চক্ষু প্রসাদ ভিন্ন শ্রোত্র প্রসাদ কিংবা জিহ্বা প্রসাদিতে পতিত হওয়া বা সংস্পর্শিত হওয়ার স্বভাব ধারণ করে না বলেই রূপালম্বনকে - “রূপালম্বন ধাতু” বলা হয়। ঠিক একইভাবে অবশিষ্ট বাহ্যিক ধাতু সমূহকেও জানতে হবে।

“চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু” - বলতে এখানে চক্ষু বিজ্ঞান কেবলমাত্র রূপালম্বনকে জানে; রূপালম্বন ভিন্ন চক্ষু বিজ্ঞান শব্দালম্বন কিংবা গন্ধালম্বনকে জানার স্বভাব ধারণ করে না, অধিকন্তু স্বীয় স্বভাব ধারণে স্থিত থাকে বলেই চক্ষু বিজ্ঞানকে - “চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু” বলা হয়। একইভাবে অবশিষ্ট উৎপন্ন ধাতু সমূহকেও জানতে হবে।

আর্য সত্য

“আর্য সত্য” - বলতে ত্রিকালে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে) যে সমস্ত সংখ্যাভীত সম্যক্ সম্বন্ধ, অগ্রশ্রাবক, মহাশ্রাবক ও প্রকৃতি শ্রাবকগণ যে সত্য দর্শন বা অধিগত দ্বারা সমুদয় সত্য নামক ভব সংযোজনকে উচ্ছিন্ন মূল পূর্বক স্বক্ক দুঃখ থেকে চির নিবৃত্তি লাভ করেন, সে সত্যকেই - “আর্য সত্য” বলা হয়।

আর যাঁরা এই পরম সত্যকে দর্শন বা অধিগত পূর্বক মার্গ জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত ক্লেশকে সমূলে গ্রহণ করেন তাঁদেরকে ‘আর্য’ নামে অভিহিত করা হয়।

আর্যসত্য চার প্রকার :

১. দুঃখ সত্য : সম্ভূত (কার্য-কারণ দ্বারা উৎপন্ন) স্বভাব ধর্মের নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি ও বিনাশ জনিত দুঃখকে পঞ্চাঙ্গ মার্গ সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি, সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প দ্বারা যথাভূতরূপে দর্শন করার বা জানার ধর্ম।

২. সমুদয় সত্য : দুঃখ সমুদয়ের কারণ ক্ষণ মুহূর্ত বর্তমান কালের পঞ্চবিষয় তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম-ভব, অবিদ্যা ও সংস্কারকে সমূলে গ্রহণতব্য ধর্ম।

৩. নিরোধ সত্য : দুঃখ সমুদয় সত্যকে সমূলে গ্রহণ পূর্বক নিরোধ সত্য নামক অসংস্কৃত, অচ্যুত ও জন্ম-মৃত্যুর অতীত মহা অসংস্কৃত নির্বাণ ধাতুকে প্রত্যক্ষ জীবনে সাক্ষাত বা অধিগম করার ধর্ম।

৪. মার্গ সত্য : দুঃখাস্ত বা দুঃখ সত্য নামক নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের উদয়-বিলয়, অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মময় স্বভাব ধর্মকে দর্শন করার ও ছেদন করার জন্য মার্গ সত্য অনুশীলিতব্য বা ভাবিতব্য ধর্ম।

নিম্নে এই চারি আর্যসত্যকে যথাযোগ্য বর্ণনা করা হল :-

দুঃখ সত্য

১. ‘দুঃখ’ শব্দটি ‘দু’ এবং ‘খ’ এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা গঠিত। ‘দু’ শব্দের অর্থ - ‘খারাপ’ আর ‘খ’ শব্দের অর্থ ‘অসার’। দুঃখের মধ্যে প্রপীড়ন, যন্ত্রণা ও অসহনীয়তা ব্যতীত উত্তম ও সুখ নামক সার বস্তু নাই বলেই দুঃখ ‘খারাপ’ ও ‘অসার’।

দেশনা বশে দুঃখ সত্য সাত প্রকার :

১. জন্ম দুঃখ : কম-বেশী দশমাস লৌহকুম্ভ নরকে অবস্থানের ন্যায় মাতৃগর্ভে থাকা কালীন যে দুঃখ ভোগ করতে হয় তাকেই - ‘জন্ম দুঃখ’ বলা হয়।

২. জরা দুঃখ : বয়োবৃদ্ধতা, বিগতযৌবন, শিথিল কলেবর, দৈহিক শক্তি হীনতা, দন্ত পতন, পঙ্ক কেশ, স্থলিত শিরা, লোল চর্ম, চলনে, শ্রবণে, দর্শনে অক্ষমতা এবং ইন্দ্রিয়ের পরিপক্বতা জনিত যে দুঃখ ভোগ করতে হয়, তাকেই - ‘জরা দুঃখ’ বলা হয়।

৩. ব্যাধি দুঃখ : মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকেই মৃত্যুর লগ্ন পর্যন্ত যে কোন রোগ দ্বারা দুঃখ ভোগ করতে হয়, তাকেই ‘ব্যাধি দুঃখ’ বলা হয়।

৪. মরণ দুঃখ : জীবেতিন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ, দেহ হতে পৃথক হওয়া, স্ফঙ্কের প্রভেদ, কলেবর নিক্ষেপ, এবং ইত্যাদির কারণে প্রাণ বায়ু নির্গমন হওয়ার ক্ষণে যে দুঃখ ভোগ করতে হয়, তাকেই ‘মরণ দুঃখ’ বলা হয়।

৫. অপ্রিয়সংযোগ দুঃখ : জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয় ব্যক্তির সাথে সংশ্রব এবং বিবিধ অনিচ্ছাকৃত বিষয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়ার কারণে যে দুঃখ ভোগ করতে হয়, তাকেই ‘অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ’ বলা হয়।

৬. প্রিয় বিয়োগ দুঃখ : মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয় বন্ধু-বান্ধব ও বিবিধ প্রিয় বস্তু হতে বিচ্ছেদ বা

হারানোর ফলে যে দুঃখ ভোগ করতে হয়, তাকেই 'প্রিয় বিয়োগ দুঃখ' বলা হয়।

৭. ঈক্ষিত বস্তু অলাভ জনিত দুঃখ : জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুহীন হওয়ার ইচ্ছা, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজন সহ প্রত্যেকে ধনে-মানে, সুখে-শান্তিতে অবস্থানের ইচ্ছা ও বিবিধ কাক্ষিত বিষয়-বস্তু অলাভ জনিত যে দুঃখ ভোগ করতে হয়, তাকেই 'ঈক্ষিত বস্তু অলাভ জনিত দুঃখ' বলা হয়। এবং সংক্ষিপ্তাকারে, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধকে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন করাকেই দুঃখ বলা হয়।

সমুদয় সত্য

১. 'সমুদয়' শব্দটি 'সং' এবং 'উদয়' এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা গঠিত। 'সং' অর্থ সমন্বয়ে বা একত্রিতভাবে আর 'উদয়' অর্থ উদিত হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া। অর্থাৎ সমুদয় সত্য নামক ক্লেশবর্ত ও কর্মবর্তদ্বয় বিপাকবর্ত স্বরূপ বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনাকে একত্রিতভাবে যত্রতত্র উৎপন্ন বা জন্ম গ্রহণ করায় বলে ইহাকে 'সমুদয় সত্য' বলা হয়।

ক্লেশবর্ত তিন প্রকার :

১. অবিদ্যা ২. তৃষ্ণা ৩. উপাদান।

কর্মবর্ত দুই প্রকার :

১. সংস্কার এবং ২. কর্ম-ভব।

(ক্লেশবর্ত ও কর্মবর্ত সম্বন্ধে প্রতিত্য সমুৎপাদ বর্ণনায় দ্রষ্টব্য)

নিরোধ সত্য

'নিরোধ' শব্দটি 'নি' এবং 'রোধ' এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা গঠিত। 'নি' অর্থ 'অভাব' আর 'রোধ' অর্থ রোধ করা বা নিঃশেষ হওয়া। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জীবনে দুঃখ সমুদয় সত্যকে সমূলে উচ্ছিন্ন মূল হওয়ার

দরুণ অনাগতে জন্ম দুঃখ সহ নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের দুঃখকে রোধ বা নিঃশেষ করা হয়েছে বলেই ইহাকে ‘নিরোধ সত্য’ বলা হয়। নিরোধ সত্য ত্রিকালের অন্তর্গত নয় বলে ইহাকে ‘কালবিমুক্ত’ ও বলা হয়। নিরোধ সত্যের অন্য নাম ‘মহা অসংস্কৃত ধাতু নির্বাণ’।

মার্গ সত্য

“কিলেসে বা মারেস্তো গচ্ছাতি^১তি মাগেগা” অর্থাৎ ক্লেশ সমূহকে বধকরে বা গ্রহান পূর্বক গমন করে বলে ‘মার্গ’ অথবা ক্লেশে ক্লিষ্ট পৃথক জন গোত্রকে ত্যাগ করে ক্লেশমুক্ত পবিত্র আর্য গোত্রে গমন করাই বলে মার্গ নামে অভিহিত করা হয়। অঙ্গ ভেদে মার্গ সত্য আট প্রকার এবং স্কন্ধ ভেদে ইহা তিন প্রকার।

শীল স্কন্ধ

১. সম্যক্ বাক্য - চার প্রকার দুষণীয় বাক্য (মিথ্যা বাক্য, পিণ্ডন বাক্য, কর্কশ বাক্য এবং সম্প্রলাপ বাক্য) কর্ম বর্জন পূর্বক সত্যযুক্ত, অর্থযুক্ত ও জ্ঞানপূর্ণ সম্যক্ বাক্য ভাষণ করা।

২. সম্যক্ কর্ম - ত্রি-দ্বারে প্রাণী হত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ ও মিথ্যা কামাচারাদি সহ যাবতীয় অকুশল কর্ম বর্জন করে ত্রি-দ্বারে নিত্য আত্মহিত ও পরহিত উত্তম কুশল কর্মাদি সম্পাদন করা।

৩. সম্যক্ আজীব - দুষ্টরিত্র মিথ্যা আজীব, অনেসণ মিথ্যা আজীব^১, কুহনা মিথ্যা^২ পাঁচ প্রকার নিষিদ্ধ বাণিজ্য^৩ পরিহার পূর্বক সদুপায়ে অর্থ-উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করা।

১. যে ভিক্ষু জীবিকা নির্বাহের জন্য বহু দান প্রাপ্তির আশায় বৃক্ষ, ফল-মূল, প্রভৃতি একুশ প্রকার কুল-দুষক অযোগ্য বস্তু সমূহকে যে কোন একটি বস্তু গৃহীণকে দান দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা।

২. নিজের নিকট যে গুণ নাই তা আছে, এরূপ ভাব ধারণ করে অন্যকে প্ররোচনা পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করা।

সমাধি স্কন্ধ

১. সম্যক্ ব্যায়াম - নির্বাণ লাভের প্রতিকূল অকুশল ধর্ম সমূহকে অনুৎপত্তি ও পরিত্যাগের প্রচেষ্টা এবং নির্বাণের অনুকূল বা সহায়ক কুশল ধর্ম সমূহকে উৎপত্তির চেষ্টা এবং উৎপন্ন ধর্ম সমূহকে অভিবৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা করা।

২. সম্যক্ স্মৃতি - চারি স্মৃতি প্রস্থানের (কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন চিত্তানুদর্শন এবং ধর্মানুদর্শন) মধ্যে যে অনুপস্সনাকে নিয়ে স্মৃতি অনুশীলন করা হয় সে অনুপস্সনার প্রকৃত স্বভাব-ধর্ম উদয়-বিলয়কে যথাভূতভাবে জানা।

৩. সম্যক্ সমাধি - স্মৃতি এবং প্রজ্ঞা যা অনুপস্সনার প্রকৃত স্বভাব-ধর্ম-উদয়-বিলয় অনিত্যকে যথাভূতরূপে দর্শন করতে পারে, এই লক্ষ্যে সম্যক্ সমাধি স্মৃতির ধ্যেয় বিষয়।

প্রজ্ঞা স্কন্ধ

১. সম্যক্ দৃষ্টি - বিদর্শনের ধ্যেয় বিষয় অনুপস্সানর লক্ষণত্রয়কে সম্যক্রূপে দর্শন করা বা যথাভূতভাবে জানা।

২. সম্যক্ সংকল্প - সম্যক্ দৃষ্টি (প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক) ও সহজাত চৈতসিক গুলোকে বিদর্শনের ধ্যেয় বিষয় অনুপস্সনাদিতে আরোহণ করায়; যাতে অনুপস্সনার লক্ষণত্রয়কে সম্যক্ দৃষ্টির দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করা যায়।

৩ . জীবন ধারণের জন্য অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, বিষ ও নেশা-দ্রব্যাদি বিক্রয় পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করা।

স্বভাব বশে আর্ষসত্য ষোল প্রকার দুঃখ সত্যেও স্বভাব চার প্রকার

১. “দুঃখস্ স পীলনট্টেঠা” : সত্ত্ব জীবগণকে নিত্য দৈহিক ও মানসিকভাবে উৎপীড়ন বা নিপীড়ন ও দুঃখস্থ করে বলেই দুঃখ সত্য - ‘পীলনার্থক’ স্বভাব।

২. “দুঃখস্ স সঙ্খতট্টেঠা” : সংস্কৃত ধর্ম নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধ অবিচ্ছিন্ন নদী স্রোতের ন্যায় উদয়-বিলয় প্রবাহের দ্বারা সত্ত্ব জীবগণকে দুঃখ প্রদান করে বলেই দুঃখ সত্য ‘সংস্কৃতার্থক’ স্বভাব।

৩. “দুঃখস্ স সন্তাপট্টেঠা” : প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ, ঈর্ষিত বস্তু অলাভ সহ বিবিধ ব্যসন (পরিহানি) দ্বারা সত্ত্ব জীবগণকে ছায় ঢাকা অগ্নি কণার ন্যায় প্রতিনিয়ত অন্তর্দাহ, বিদগ্ধ ও সন্তাপিত করে বলেই দুঃখ সত্য ‘সন্তাপার্থক’ স্বভাব।

৪. “দুঃখস্ স বিপরিনামট্টেঠা” : দৈহিক জরা, ব্যাধি, মরণ, জীর্ণতা ও ইন্দ্রিয় পরিপক্বতা অথবা দৈহিক অক্ষমতা এবং মানসিক শোক-সন্তাপ ও বিকারতা না হোক, এরূপ হাজারো কামনা-প্রার্থনা করা সত্ত্বেও এরূপ বিপরীনাম ধর্মতা প্রাপ্ত হয়ে সত্ত্ব জীবগণকে যন্ত্রণায় জর্জরিত ও দুঃখস্থ করে বলেই দুঃখসত্য - ‘বিপরিনামার্থক’ স্বভাব।

সমুদয় সত্যের স্বভাব চার প্রকার :

১. “সমুদয়স্ স আয়ুহনট্টেঠা” : ক্ষণ মুহূর্ত বর্তমান কালে তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম-ভব, অবিদ্যা ও সংস্কার এই পঞ্চ বিষয় অনাগতে পুনঃরায় নাম-রূপ পঞ্চ স্কন্ধকে উৎপত্তি ভবে জন্মধারণ করার জন্য প্রতিনিয়ত ত্রি-দ্বারে নতুন নতুন কর্ম সম্পাদন করে পুনঃজন্মেও বীজ স্বরূপ সংস্কার (পুনঃজন্মের কৃত কর্মের শক্তি) সঞ্চয় করে বলেই সমুদয় সত্য ‘আয়ুহনর্থক’ স্বভাব।

২. “সমুদয়স্ নিদানাট্টেঠা” : দুঃখ সত্য নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তির তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম-ভব, অবিদ্যা ও সংস্কার মূল হেতু বা জনক বলেই সমুদয় সত্য ‘নিদানার্থক’ স্বভাব।

৩. “সমুদয়স্ সংযোগাট্টেঠা” : সত্ত্বগণকে ত্রিলোকে (কাম লোক, রূপ লোক ও অরূপ লোকে) প্রতিসন্ধি করায় বা জন্মগ্রহণ করায় বলেই সমুদয় সত্য ‘সংযোগার্থক’ স্বভাব।

৪. “সমুদয়স্ পলিবোধট্টেঠা” : দুঃখ মুক্তি তথা নবলোকুত্তর ধর্ম (চারি মার্গ ও চারি ফল সহ মহা অসংস্কৃত নির্বাণ) অধিগত করণে পলিবোধ বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বলেই সমুদয় সত্য ‘পলিবোধার্থক’ স্বভাব।

নিরোধ সত্য চার প্রকার :

১. “নিরোধস্ নিঃসরণট্টেঠা” ক্লেশবর্ত, কর্মবর্ত ও বিপাকবর্ত এই ত্রি-বর্ত হতে নিঃসরণ বা বিমুক্ত বলেই নিরোধ সত্য ‘নিঃসরণার্থক’ স্বভাব।

২. “নিরোধস্ বিবেকট্টেঠা” সমস্ত ক্লেশ ও সংস্কারকে বর্জন করে বা পৃথক হয়ে থাকে বলেই নিরোধ সত্য ‘বিবেকার্থক’ স্বভাব।

৩. “নিরোধস্ অসংস্কৃত্যট্টেঠা” হেতু প্রত্যয় সম্প্রযুক্ত সংস্কৃত ধর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন বা আলাদা বলেই নিরোধ সত্য ‘অসংস্কৃত্যার্থক’ স্বভাব।

৪. “নিরোধস্ অমৃতট্টেঠা” প্রতিত্যসমুৎপাদ নীতির জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ স্রোতকে চিররুদ্ধ করে অমৃত হয় বলেই নিরোধ সত্য ‘অমৃতার্থক’ স্বভাব।

মার্গ সত্য চার প্রকার :

১. ‘মগ্নস্ স নিয়্যানাট্টো’ ত্রি-বর্ত (ক্লেশবর্ত, কর্মবর্ত ও বিপাকবর্ত) হতে নির্গমন বা নিষ্ক্ৰমণ করাই বলেই মার্গ সত্য ‘নৈয়্যানিকার্থক’ স্বভাব।

২. ‘মগ্নস্ স হেতুট্টো’ নির্বাণ লাভের অনুকূল সহায়ক ধর্ম সমূহের উৎপত্তির মূখ্য হেতু বা জনক বলেই মার্গ সত্য ‘হেতুার্থক’ স্বভাব।

৩. ‘মগ্নস্ স দস্ সনট্টো’ দুঃখ সত্য নাম রূপ পঞ্চ স্কন্ধের উদয়-বিলয়, অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম স্বভাব ধর্ম সমূহকে দর্শন করায় এবং মহাঅসংস্কৃত ধাতু নির্বাণকে দর্শন বা অধিগত করায় বলেই মার্গ সত্য ‘দর্শনার্থক’ স্বভাব।

৪. ‘মগ্নস্ স আধিপতেয়্যাট্টো’ তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম-ভব, অবিদ্যা ও সংস্কারকে সমূলে উচ্ছিন্নমূল বা ধ্বংস করণ পূর্বক প্রতিত্য সমুৎপাদ নীতির জন্ম-মৃত্যুর সংসরণ চক্রকে ভগ্ন করে এবং চিরমুক্ত হয়ে এর উপর অধিপত্যয়তা বিস্তার করে বলেই মার্গসত্য ‘অধিপত্যয়ার্থক’ স্বভাব। এই পরমার্থ ধর্ম চারি আর্ষ সত্য স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করে না বা স্ব-স্বভাব নিয়মে স্থিত থাকে বলে ‘তথা’। চারি আর্ষ সত্যের স্ব-স্বভাব অভ্রান্ত বা ধ্রুব সত্য বলে ‘অবিতথা’ আর দেব-ব্রহ্মা, ঈশ্বর-সৃষ্টিকর্তাদির দ্বারা চারি আর্ষসত্যের স্ব-স্বভাব পরিবর্তন করিয়ে দেওয়া বা পাল্টিয়ে দেওয়া অসম্ভব অথবা চারি আর্ষসত্য স্থায়ী স্বভাব হতে ভিন্নতা হয়না বলেই ‘অনঞ্জথা’।

চারি আর্ষসত্যের লক্ষণ, রস ও প্রত্যুপ্রস্থান

দুঃখ সত্য :

‘প্রপীড়নই’ দুঃখ সত্যের লক্ষণ।

‘সন্তাপনই’ দুঃখ সত্যের রস।

‘সংসরণ বা প্রবর্তনই’ দুঃখ সত্যের প্রত্যুপ্রস্থান।

সমুদয় সত্য :

- ‘প্রভব বা উৎপত্তি’ করণই সমুদয় সত্যের লক্ষণ ।
- ‘অনুপচ্ছেদ’ করণই সমুদয় সত্যের রস ।
- ‘প্রতিবন্ধকতাই’ সমুদয় সত্যের প্রত্যুপস্থান ।

নিরোধ সত্য :

- ‘শান্তিই’ নিরোধ সত্যের লক্ষণ ।
- ‘অচ্যুত’ করণই নিরোধ সত্যের রস ।
- ‘অনিমিত্তই’ নিরোধ সত্যের প্রত্যুপস্থান ।

মার্গ সত্য :

- ‘নির্গমণই’ মার্গ সত্যের লক্ষণ ।
- ‘ক্লেশ গ্রহণই’ মার্গ সত্যের রস ।
- ‘অপ্রমত্ততাই’ মার্গ সত্যের প্রত্যুপস্থান ।

চারি আর্য সত্যের উপমা

প্রথম উপমা :

১. ‘দুঃখ সত্য - ভার বা বোঝার সদৃশ ।
২. সমুদয় সত্য - ভার বাহকের সদৃশ ।
৩. নিরোধ সত্য - ভাব নিক্ষেপ সদৃশ ।
৪. মার্গ সত্য - ভার নিক্ষেপের উপায় সদৃশ ।

দ্বিতীয় উপমা :

১. দুঃখ সত্য - অসহনীয় রোগের সদৃশ ।
২. সমুদয় সত্য - রোগের উৎপত্তির কারণ সদৃশ ।
৩. নিরোধ সত্য - রোগ নিরাময় বা উপশম সদৃশ ।
৪. মার্গ সত্য - রোগ উপশমের উপায় সদৃশ ।

তৃতীয় উপমা :

১. দুঃখ সত্য - বিষবৃক্ষের সদৃশ
২. সমুদয় সত্য - বিষবৃক্ষের মূল সদৃশ ।
৩. নিরোধ সত্য - বিষ বৃক্ষের উচ্ছিন্ন মূল সদৃশ ।
৪. মার্গ সত্য - বিষবৃক্ষের মূল উচ্ছিন্ন করণের উপায় সদৃশ ।

প্রতিত্যসমুৎপাদ নীতি

“পটচ্চসমুৎপাদ” শব্দটি ‘পটচ্চ’ ‘সং’ ও ‘উৎপাদ’ এই শব্দত্রয়ের সমন্বয়ে গঠিত। ‘পটচ্চ’ অর্থ প্রত্যয়ের দ্বারা, ‘সং’ অর্থ সহজাত ধর্ম সমূহের সমন্বয়ে আর ‘উৎপাদ’ অর্থ হচ্ছে উদয় হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া। অর্থাৎ “পটচ্চসমুৎপাদ” এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যয়ের শক্তি দ্বারা সহজাত ধর্ম সমূহের যথাভূতভাবে সুসমন্বয়ে উৎপন্ন হওয়া। অথবা একও নয়, ভিন্নও নয় একে অপরের উপকার হয়ে উৎপন্ন হওয়াকেই “পটচ্চসমুৎপাদ বা প্রতিত্যসমুৎপাদ” বলা হয়। প্রতিত্যসমুৎপাদ ইহা এক অবিচ্ছিন্ন সমুদয় সত্য ও দুঃখ সত্যের প্রবাহের নিয়ম। যা অতীত সমুদয় সত্যের কারণে বর্তমান দুঃখ সত্যের উৎপত্তি এবং বর্তমান দুঃখ সত্যকে মার্গ দ্বারা দুঃখ সত্যকে পরিজ্ঞাত না হওয়াতে, ক্ষণ মুহূর্ত বর্তমান কালে সমুদয় সত্য নামক ক্লেশবর্ত ও কর্মবর্তদ্বয় দুঃখ সত্যকে আশ্রয় করে অনাগতে দুঃখ নামক বিপাক-বর্তকে লাভ করার জন্য পুনঃজন্মের সংস্কার (উদগক্ষ্ম সুপ্ত বীজ শক্তির ন্যায় পুনঃজন্ম গ্রহণের কৃত কর্মের শক্তি) সঞ্চয় করে থাকে।

এভাবে সত্ত্বগণ বর্তমান দুঃখ সত্যের প্রতি দৃষ্টি বিপ্রলাস (দৃষ্টি ভ্রম) গ্রস্থ হয়ে পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করে জন্ম-দুঃখ, জরা-দুঃখ, ব্যাধি-দুঃখ, মরণ-দুঃখ সহ শোক, পরিতাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং উপায়াসাদি বহনে অসহনীয় স্ফঙ্কের দুঃখ পুঞ্জ রাশি উৎপন্ন করে দুঃখ ভোগ করে থাকে।

এই অসহনীয় দুঃখের ভারকে নিক্ষেপ করতে চাইলে মার্গ ভাবনা অনুশীলন ব্যতীত আর অন্য কোন মার্গ বা উপায় নাই। আর মার্গ ভাবনা অনুশীলনে সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধকতা হল - ‘দৃষ্টি’ (শাস্বত দৃষ্টি, উচ্ছেদ দৃষ্টি ও সৎকায় দৃষ্টি)। তাই মার্গ ভাবনা করার পূর্বে দৃষ্টিকে তদাঙ্গ প্রহাণের (সাময়িক প্রহাণ) দ্বারা পরিত্যাগ করা চাই। কাজেই জেনে রাখা ভালো যে, দৃষ্টিকে পরিত্যাগ করার সব চাইতে

নিকটতম পন্থা হল প্রতিত্যসমুৎপাদ নীতির - দুই মূল, দুই সত্য, চারি অংশ, দ্বাদশ অঙ্গ, ত্রি-সংযোগ, ত্রি-বর্ত, ত্রি-কাল, এবং বিংশ বিষয়ের এই আট সূত্রকে অনুলোম ও প্রতিলোমাকারে যথার্থ মনোযোগের সহিত হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া বা রপ্ত করে নেওয়া। সবচাইতে উত্তম হয় যদি এই প্রতিত্যসমুৎপাদ নীতির উপর দক্ষ ও পারঙ্গম গুরুর সান্নিধ্যে গিয়ে শিক্ষা করলে বা রপ্ত করে নিলে।

পটিচসমুপ্পাদ পালি (অনুলোম)

ইতি ইমস্মিৎ সতি ইদং হোতি, ইমস্স উপ্পাদ ইদং উপ্পজ্জতি। যদিদং অবিজ্জা পচ্চয়া সজ্জার, সজ্জারা পচ্চয়া বিঞ্ঞাণাং, বিঞ্ঞাণ পচ্চয়া নাম-রূপং, নাম-রূপং পচ্চয়া সলাযতনং, সলাযতন পচ্চয়া ফস্সো, ফস্সো পচ্চয়া বেদনা, বেদনা পচ্চয়া তণ্হা, তণ্হা পচ্চয়া উপাদানং, উপাদান পচ্চয়া ভব, ভবো পচ্চয়া জাতি, জাতি পচ্চয়া জরা-মরণ-সোক-পরিদেব-দুক্খ-দোমনস্সু-পায়াসা সম্ভবন্তি। এবমে তস্স কেবলস্স দুক্খক্কস্স সমুদযো হোতি।

পটিচসমুপ্পাদ বাংলা (অনুলোম)

অর্থাৎ- ওটা থাকলে এটা হয় এবং ওটার উৎপত্তিতে এটার উৎপত্তি হয়। ঠিক সে ভাবে, অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নাম-রূপ, নাম-রূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জাতি, জাতির কারণে জরা, মরণ, শোক, পরিতাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং উপায়াসাদি উৎপন্ন হয়। এভাবে কেবলমাত্র দুঃখ স্কন্ধ সমূহের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

পটিচসমুপ্পাদ পালি (প্রতিলোম)

ইতি ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্স নিরোধ ইদং নিরুজ্জতি ।
যদিদং অবিজ্জায়ত্বেব অসেস বিরাগ নিরোধা সজ্জরা নিরোধো,
সজ্জরা নিরোধা বিঞ্ঞাণ নিরোধো, বিঞ্ঞাণ নিরোধা নাম-রূপ
নিরোধো, নাম-রূপ নিরোধা সালায়তন নিরোধো, সালায়তন
নিরোধা ফস্স নিরোধো, ফস্স নিরোধা বেদনা নিরোধো, বেদনা
নিরোধা তণ্হা নিরোধো, তণ্হা নিরোধা উপাদান নিরোধো,
উপাদান নিরোধা ভব নিরোধো, ভব নিরোধা জাতি নিরোধো, জাতি
নিরোধা জরা মরণ-সোক-পরিদেব-দুখ-দোমনস্স উপায়াসা
নিরুজ্জাতি । এবমে তস্স কেবলস্স দুখক্কস্স নিরোধো
হোতি ।

পটিচসমুপ্পাদ বাংলা (প্রতিলোম)

অর্থাৎ ওটা না থাকলে এটা হয় না এবং ওটার নিরোধে এটার
নিরোধ হয় । ঠিক একই নিয়মে - অবিদ্যার নিঃশেষ, বিরাগ ও
নিরোধের কারণে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধের কারণে
বিজ্ঞান নিরোধ হয়, বিজ্ঞান নিরোধের কারণে নাম-রূপ নিরোধ হয়,
নাম-রূপ নিরোধের কারণে ষড়ায়তনের নিরোধ হয়, ষড়ায়তনের
নিরোধের কারণে স্পর্শ নিরোধ হয়, স্পর্শের নিরোধের কারণে
বেদনা নিরোধ হয়, বেদনা নিরোধের কারণে তৃষ্ণা নিরোধ হয়,
তৃষ্ণা নিরোধের কারণে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদান নিরোধের
কারণে ভব নিরোধ হয়, ভব নিরোধের কারণে জাতি নিরোধ হয়,
জাতি নিরোধের কারণে জরা, মরণ, শোক, পরিতাপ, দুঃখ,
দৌর্মনস্য এবং উপায়াসাদি নিরোধ হয় । এভাবেই কেবলমাত্র দুঃখ
সমূহই নিরোধ হয়ে থাকে । প্রতিত্যসমুৎপাদে দ্বাদশাঙ্গ দুই
মূল, দুই সত্য, চারি অংশ, ত্রি-সংযোগ, ত্রি-বর্ত, ত্রি-কাল এবং
বিংশ বিষয় সহ এই আট সূত্রকে নিয়ে বর্ণনা করা হল ।

অবিদ্যা

“বিন্দিয়ং ন বিন্দিতী”তি অবিজ্ঞা” অর্থাৎ জ্ঞাতব্য ধর্মকে জ্ঞাত হয়না বলেই ‘অবিদ্যা’। যেমন :

১. দুঃখ সত্য নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধ যে মুহূর্তহীন ভাবে উদয়-বিলয় হয়ে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মময়তা প্রাপ্ত হচ্ছে, তা না জানাই ‘অবিদ্যা’।

২. সমুদয় সত্য তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম-ভব, অবিদ্যা ও সংস্কার যে দুঃখ সমুদয় সত্য, এটা যে সমূলে গ্রহণ করার ধর্ম তা না জানাই ‘অবিদ্যা’।

৩. দুঃখ সত্যকে যথাভূতভাবে জানতে পারলে সমুদয় সত্য আর উৎপন্ন হতে পারে না। যেমনঃ দুঃখ সত্য বেদনাকে পঞ্চাঙ্গমার্গ দ্বারা উদয়-বিলয় ও অনিত্যরূপে দর্শন করাতে সমুদয় সত্য তৃষ্ণা আর উৎপন্ন হতে পারে না। অর্থাৎ প্রত্যয়ের অভাবের কারণে তৃষ্ণা নিরোধ হয়। আর তৃষ্ণা নিরোধের কারণে যে দুঃখ নিরোধ হয় এবং দুঃখ নিরোধে যে ‘পরম সুখ নির্বাণ’ তা না জানাই ‘অবিদ্যা’।

৪. দুঃখ নিরোধের উপায় অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা ব্যতীত অন্যকোন মার্গ বা উপায়ের দ্বারা দুঃখ মুক্তি যে অসম্ভব তা না জানাই ‘অবিদ্যা’।

৫. পূর্বাস্ত না জানা। অর্থাৎ অতীতের সমুদয় সত্য অবিদ্যা ও সংস্কারের কারণে যে বর্তমান দুঃখ সত্য বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনার উৎপত্তি হয়েছে, তা না জানাই ‘অবিদ্যা’।

৬. অপরাস্ত না জানা। অর্থাৎ ক্ষণমুহূর্ত বর্তমান কালের সমুদয় সত্য তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম-ভবের কারণে অনাগতে দুঃখ সত্য জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিতাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং উপায়াসাদি সহ স্কন্ধ দুঃখ রাশি সমূহ উৎপন্ন হবে, তা না জানাই ‘অবিদ্যা’।

৭. পূর্বান্ত অপরান্ত না জানা। অর্থাৎ অতীত সমুদয় সত্যের কারণে বর্তমান দুঃখ সত্য এবং বর্তমান দুঃখ সত্যকে আশ্রয় করে ক্ষণ মুহূর্ত তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্ম-ভব নামক দুঃখ সমুদয় সত্যের কারণে অনাগতে পুনঃরায় দুঃখ সত্যকে উৎপন্ন করাবে তা না জানাই ‘অবিদ্যা’।

উপরোক্ত সাত প্রকার জ্ঞাতব্য ধর্ম সমূহকে জ্ঞাত হয় না বলেই ‘অবিদ্যা’। আর উক্ত সাত প্রকার জ্ঞাতব্য ধর্ম সমূহ ব্যতীত অন্য বিষয়কে জ্ঞাত না হলে তা অবিদ্যার ক্রেশে অন্তর্গত নয়।

সংস্কার

“সংস্কারমভি সংস্করেতীতি সংস্কারা” - অর্থাৎ সংস্কার বিষয় সমূহকে অভিসংস্করণ করে বলেই ‘সংস্কার’। অথবা কৃতকর্মের শক্তি পুনঃ জাগ্রত হয়ে নতুনভাবে কৃতকর্মের বিপাক প্রদান করে বলেই ‘সংস্কার’ বলে।

ত্রি-কালানুসারে সংস্কার অতীত কালীক। অবিদ্যার প্রত্যয়ে প্রত্যয়িত সংস্কারের প্রত্যয় শক্তি দ্বারা বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনাদি দুঃখ সত্য বিপাকবর্তকে উৎপন্ন করে থাকে।

সংস্কার কিভাবে বিজ্ঞান, নাম-রূপাদি দুঃখ সত্য বিপাক বর্তকে উৎপন্ন করে তা একটা উদাহরণের দ্বারা কিছুটা অনুমেয়। যেমনঃ কোন এক ব্যক্তি গো-ঘাতকাদি কর্ম করেই জীবিকা নির্বাহ করত। পরবর্তী সময়ে সে এক সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর শয্যায় শায়িত হল। মৃত্যুকালে গো-ঘাতকাদি কর্ম তার মানস পথে উদ্ভিত হল। অর্থাৎ কৃতকর্মের সংস্কার জাগ্রত হল (কৃতকর্মের নিমিত্ত)। জাগ্রত সংস্কার বিপাক প্রদানের জন্য ভূমি নির্ণয় করল (গতি নিমিত্ত)। প্রত্যয় শক্তি রেখে সংস্কারের বিলয় (চ্যুতি চিন্ত)। রেখে যাওয়া প্রত্যয় শক্তির দ্বারা প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের উৎপত্তি (চারি অপায়ে প্রতিসন্ধি বা জন্মগ্রহণ)। উপরোক্ত উদাহরণের দ্বারা

অনুমেয় যে, সংস্কার অতীত কালীক হিসেবে সমুদয় সত্য আর প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান বর্তমান কালীক হিসেবে দুঃখ সত্য। অর্থাৎ অতীত সমুদয় সত্যের কারণে বর্তমান দুঃখসত্য উৎপত্তি হয়েছে। এভাবেই কৃতকর্মের সংস্কার পুনঃজাগ্রত হয়ে, একত্রিশ লোক ভূমিতে প্রতিসন্ধি বা জন্মগ্রহণ করিয়ে বিপাকাদি প্রদান করে বলেই ‘সংস্কার’ নামে অভিহিত করা হয়।

(আরো জানতে স্কন্ধ বর্ণনায় দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞান

“অবুস্তে পন বিজানাতীতি বিঞ্ঞাণং” অর্থাৎ জ্ঞাত না করালেও বিশেষভাবে জানে এই অর্থেই ‘বিজ্ঞান’। অথবা সংস্কার প্রত্যয়ে প্রত্যয়িত এই বিজ্ঞানকে মানুষ, দেব-ব্রহ্মা তথা ঈশ্বর-সৃষ্টিকর্তাদির দ্বারা জ্ঞাত করিয়ে দিতে হয় না যে, মনুষ্য কূলে, দেব কূলে, ব্রহ্মা কূলে অথবা চারি অপায়ে প্রতিসন্ধি বা জন্মগ্রহণ করতে। কেবলমাত্র কুশলাকুশল ও অনেঞ্জাভি সংস্কারের দ্বারা যে যে ভাবে প্রত্যয়িত হয়েছে, ঠিক সে সে ভাবে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান ও সে সে কূলে প্রতিসন্ধি বা জন্মগ্রহণ করে থাকে। যেমনঃ কুশল সংস্কারের দ্বারা প্রত্যয়িত প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান মনুষ্য কূলে, দেব কূলে ও রূপ ব্রহ্মকূলে; অনেঞ্জাভি সংস্কারের দ্বারা প্রত্যয়িত প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান অরূপাবচর ব্রহ্মা কূলে এবং অপুণ্যাভি সংস্কারের দ্বারা প্রত্যয়িত প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান চারি অপায়ে প্রতিসন্ধি বা জন্মগ্রহণ করে থাকে।

বিজ্ঞান দুই প্রকার। যথাঃ প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান ও প্রবর্তন বিজ্ঞান। তৎমধ্যে দুই প্রকার উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত, আট প্রকার মহাবিপাক চিত্ত ও মহদগত বিপাক চিত্ত নয় প্রকার এই উনিশ বিপাক চিত্তকেই প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান জীবনে কেবলমাত্র একবারই উৎপন্ন হয় থাকে। আর চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকাদি প্রবর্তন বিজ্ঞান সমূহ চলমান জীবনে

আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দ্বাদশ আয়তনাদির কারণে অগণিতবার, অসংখ্যবার উৎপন্ন হতে পারে।

নাম-রূপ

“নমস্তীতি নামং”- ষড়ালম্বনের (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম) নমিত হয়- এই অর্থে-নাম।

“রূপস্তীতি রূপং” শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা ও পিপাসাদি সহ ইত্যাদি প্রতিকূলতার কারণে রূপ বিরূপতা বা বিকার গ্রস্থতা হয় বলেই - ‘রূপ’।

নাম বলতে বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারত্রয়কে ‘নাম’ বলে। কারণ এরা আলম্বনের দিকে নমনের স্বভাব ধারণ করে। আর ‘রূপ’ বলতে চারি প্রকার ভূত রূপ ও চব্বিশ প্রকার উৎপন্ন রূপ মোট এই আঠাইশ প্রকার সমূহকেই একসাথে ‘রূপ’ নামে অভিহিত করা হয়। কারণ রূপ সমূহ বিরূপ-ভাব ধারণের স্বভাব বৈশিষ্ট্যতা ধারণ করে। দ্বৈতভাবে নাম-রূপকে এখানে এক বিশেষ অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের দ্বারা প্রত্যয়িত এই নাম-রূপদ্বয় মাতৃগর্ভে উৎপত্তি ক্ষণে অঞ্ঞমঞ্ঞ প্রত্যয় হয়। অর্থাৎ একে অপরকে বিচ্ছেদ পূর্বক উৎপন্ন না হয়ে, একই সাথে একই ক্ষণে নাম-রূপদ্বয় যুগ্মাকারে উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু, প্রবর্তন ক্ষণে অঙ্ক ও খণ্ড পরস্পরকে আশ্রয় বা সাপেক্ষ পূর্বক পথ অতিক্রমের ন্যায় নাম-রূপও একে অপরের উপনিশ্রয় প্রত্যয় (পরস্পরের নির্ভরতা বা সাপেক্ষতা) হয়ে প্রবর্তিত হয়ে থাকে।

ষড়ায়তন

“তনোতি আয়তনযং চ নযতীতি আয়তনং” অর্থাৎ অনাদিকাল সংসার পরিভ্রমণকে সুদীর্ঘ ও বিস্তৃতি পূর্বক স্বক্কের দুঃখ পুঞ্জকে আনায়ন করে বা প্রতিষ্ঠা করে এই অর্থেই - ‘আয়তন’ বলা হয়।

আয়তন এটা মূলত একটি ক্ষেত্র। যেক্ষেত্রে সমুদয় সত্য (ক্লেশবর্ত ও কর্মবর্ত) স্বরূপ কৃষক কর্ম সম্পাদন পূর্বক দুঃখ সত্য (বিপাকবর্ত) স্বরূপ ফলোৎপাদন করে থাকে। কাজেই, আয়তনকে সমুদয় সত্যের কর্ম ক্ষেত্র ও দুঃখ সত্যের উৎপত্তি ক্ষেত্র বললেও অত্যুক্তি হবে না বলে মনে হয়। এখানে ষড়ায়তন বলতে - চক্ষু প্রসাদই চক্ষু আয়তন, শ্রোত্র প্রসাদই শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণ প্রসাদই ঘ্রাণায়তন, জিহ্বা প্রসাদই জিহ্বায়তন, কায় প্রসাদই কায়ায়তন এবং মনই মনায়তন। উক্ত ছয় প্রকার আয়তনকেই ষড়ায়তন নামে কথিত।

স্পর্শ

“ফুসতীতি ফসুসো” বিষয়ালম্বনকে স্পর্শ করে বলেই ‘স্পর্শ’। মূলতঃ স্পর্শ বলতে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আয়তনাদির যে সম্মিলন, সংযোগ বা সংস্পর্শন তাকেই - ‘স্পর্শ’ বলে।

স্পর্শের বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণার জন্য রাজা মিলিন্দ ও নাগসেন ভাস্তের প্রশ্নোত্তরের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

ভাস্তে নাগসেন! স্পর্শে লক্ষণ কি?

মহারাজ! স্পর্শ করাই স্পর্শের লক্ষণ।

ভাস্তে! স্পর্শের স্বচ্ছ ধারণার জন্য উপমা প্রদান করুন।

মহারাজ! যেমন ধরণ, দুইটি ভেড়া যুদ্ধ করে, দুই ভেড়ার মধ্যে এক ভেড়াকে চক্ষুর ন্যায় এবং অন্য ভেড়াকে রূপালম্বনের ন্যায় জানতে হবে। দুই ভেড়ার মধ্যে যে সংযোগ তাকেই ‘স্পর্শ’ রূপে বুঝতে হবে।

ভান্তে দয়া করে আরো উপমা প্রদান করুন।

মহারাজ! যেমন কোন লোক দুই হাতে তালি বাজায়, সে দুই হাতের মধ্যে একহাতকে চক্ষুর ন্যায় এবং অন্য হাতকে রূপালম্বনের ন্যায় জানতে হবে। হাত তালি বাজাতে দুই হাতের যে সংযোগ হয়, সে সংযোগকেই ‘স্পর্শ’ রূপে বুঝতে হবে।

আয়তন ভেদে স্পর্শ ছয় প্রকার :

১. চক্ষু সংস্পর্শ ২. শ্রোত্র সংস্পর্শ ৩. ঘ্রাণ সংস্পর্শ ৪. জিহ্বা সংস্পর্শ ৫. কায় সংস্পর্শ এবং ৬. মন সংস্পর্শ।

বেদনা

“বেদযতীতি বেদনা” অর্থাৎ ষড়ালম্বনের রসানুভব করে এই অর্থেই ‘বেদনা’ বেদনা তিন প্রকার। যথাঃ ১. সুখ বেদনা ২. দুঃখ বেদনা ৩. উপেক্ষা বেদনা। মূলতঃ বেদনা এটা একটি সংবেদনীয় মানসিক অনুভূতি। যা চলমান জীবনে সত্ত্বগণ বা জীবগণ অবিচ্ছিন্ন প্রদীপ শিখার ন্যায় মুহূর্তহীন ভাবে এই বেদনা অনুভব করে থাকে। প্রত্যয়াকারে বেদনা স্পর্শের কারণেই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যে যে ভাবে স্পর্শের প্রত্যয়িত হয়েছে, ঠিক সে সে ভাবে বেদনা উৎপন্ন হয়ে থাকে।

যেমনঃ ইষ্ট বা কোমলালম্বনের স্পর্শে ‘সুখ বেদনা’। অনিষ্ট বা কর্কশালম্বনের স্পর্শে ‘দুঃখ বেদনা এবং ইষ্টানিষ্ট বিহীন আলম্বনের স্পর্শের কারণে ‘উপেক্ষা বেদনা’ উৎপন্ন হয়। এই বেদনায় জীবন ধারাকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বিন্যাসে সজ্জিত করে তোলে। সুখ বেদনা মানুষের মুখ মণ্ডলকে হাস্যোজ্জ্বল ও সুখান্বিত করে আর দুঃখ বেদনা মানুষের মুখ মণ্ডলকে বিষাদপূর্ণ ও দুঃখান্বিত করে থাকে। সুতরাং এই বেদনা থেকেই নিত্যই নতুন-নতুন চাওয়া-পাওয়ার ইত্যাদির উন্মেষ ঘটে।

তৃষ্ণা

“পরিতস্‌সতী”তি তণ্‌হা” পরিতৃষ্ণার্ত করে বা লালায়িত করে এই অর্থেই - ‘তৃষ্ণা’। পিপাসা কাতর লোকের ন্যায় তৃষ্ণাও সত্ত্ব বা জীবগণকে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রতিনিয়ত উত্তেজিত ও প্রকম্পিত করে থাকে। তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত মানুষের পক্ষে এমন কোন কাজ নাই যা তার দ্বার করা অসম্ভব। যদিওবা তৃষ্ণা চরিতার্থতার কোন পরিসমাপ্তি নাই, তার পরও তৃষ্ণার অনলে প্রজ্বলিত জ্ঞান-শূন্য অন্ধ মানুষেরা লবনাক্ত জলের দ্বারা পিপাসা নিবারনের ন্যায় প্রচেষ্টার যেন বিরামতা নাই। পুদ্‌গলের স্বভাব বা আলম্বনের ভিন্নতার কারণে তৃষ্ণা তিন প্রকার। যথাঃ

১. কাম তৃষ্ণা - বলতে কাম্যবস্তুর প্রতি যে স্পৃহা বা উপভোগের মানসিক প্রবৃত্তি তাকেই কামতৃষ্ণা বলে। যেমনঃ রূপের প্রতি, শব্দের প্রতি, গন্ধের প্রতি, রসের প্রতি, কায়ের প্রতি এবং ধর্মের প্রতি যে স্পৃহা বা কামনা-বাসনা তাহাই - ‘কাম তৃষ্ণা’।

২. ভব তৃষ্ণা - কাম লোকে, রূপ লোকে এবং অরূপ লোকে জন্মগ্রহণ করার জন্য উক্ত ত্রি-লোকাসক্ত হয়ে যে কর্মাদির অনুষ্ঠান করা হয় তাহাই - ‘ভব তৃষ্ণা’।

৩. বিভব তৃষ্ণা - বলতে প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ ও ঈক্ষিত বস্তুর অলাভ অথবা জরা, ব্যাধি জনিত দৈহিক এবং মানসিকভাবে অতীব দুঃখগ্রস্থ জ্ঞান শূন্য মানুষেরা একরূপ দৃষ্টি পোষণ করে যে, মরে গেলেই বাঁচি। মরে গেলেই একরূপ অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার। মরণই সব সমাধান। অথবা পুনঃজন্ম অবিশ্বাসীরা খাও-দাও ফুটি কর, ঋণ নিয়ে হলেও ঘি খাও ইত্যাদি একরূপ দৃষ্টি পোষণকারীর স্পৃহা বা কামনা-বাসনাকেই - ‘বিভব-তৃষ্ণা’ বলে।

ইন্দ্রিয় ও ত্রি-কালানুসারে তৃষ্ণা মোট একশত আট প্রকার।

উপাদান

“উপাদীযতী”তি উপাদনং” কাজিত বিষয় বস্তুতে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরা বা গ্রহণ করা এই অর্থেই - ‘উপাদান’। মূলতঃ উপাদান তৃষ্ণারই নামান্তর। কিন্তু, তৃষ্ণা এবং উপাদান ইহাই পার্থক্য; তৃষ্ণা বিষয় বস্তুকে পরিভোগের ইচ্ছা করে আর উপাদান বিষয় বস্তুকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরে। মূল কথা হচ্ছে তৃষ্ণার অত্যাধিক বলবন্ততাই উপাদান।

উপাদান চার প্রকার। যথাঃ

১. কাম-উপাদান - তৃষ্ণার কাম্যবস্তু রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং ধর্ম এই ছয় প্রকার কাম বিষয়ালম্বনকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরাকেই - ‘কাম উপাদান’ বলে।

২. দৃষ্টি উপাদান - দৃষ্টি বলতে এখানে মিথ্যা ধারণা বা ভ্রান্ত বিশ্বাসকেই বলা হয়েছে। যেমনঃ মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ ব্যক্তির কর্ম ও কর্ম-ফলের প্রতি অবিশ্বাস, চারি আর্ষসত্যের প্রতি অবিশ্বাস, অতীতের কারণে বর্তমান এবং বর্তমান কারণে ভবিষ্যৎ গঠিত হবে তা অবিশ্বাস করা, ত্রিরত্ন গুণের প্রতি অবিশ্বাস, পঞ্চ অনন্তগুণের প্রতি অবিশ্বাস, জন্ম-মৃত্যু প্রতিত্য সমুৎপাদের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম তা বিশ্বাস না করা অথবা অনিত্যকে নিত্য রূপে, দুঃখকে সুখ রূপে, অনাত্মকে আত্ম রূপে এবং অশুভকে শুভরূপে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করা, এরূপ দৃষ্টিকেই - ‘দৃষ্টি উপাদান’ বলে।

৩. শীলব্রত উপাদান - বলতে নিজের দুঃখ মুক্তির জন্য কৃচ্ছ্র-সাধনব্রত, নানাবিধ মানত-পূজাদিরব্রত এবং ঈশ্বর-ভগবানকে সকাল সন্ধ্যা পূজা-অর্চনাদির দ্বারা প্রীত বা সন্তুষ্ট করতে না পারলে দুঃখ মুক্তি মিলবে অন্যথায় দুঃখ মুক্তি অসম্ভব। এরূপ ব্রত ধারণাকে দৃঢ়তার সহিত আঁকড়ে ধরা বা গ্রহণ করাকেই - ‘শীলব্রত উপাদান’ বলে।

৪. আত্মবাদ উপাদান - এই নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধকে আমি, আমার, নিত্য ও আত্ম ইত্যাদি বশে উৎপন্ন সৎকায় দৃষ্টিকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরা বা গ্রহণ করাকেই - ‘আত্মবাদ উপাদান’।

কর্ম-ভব

“ভবতি ভাবয়তি চাতি ভবো” বলতে উৎপন্ন হয়, অভিবৃদ্ধি হয় এই অর্থেই ‘ভব’। ভব দুই প্রকার, যথাঃ কর্ম-ভব ও উৎপত্তি ভব।

১. কর্মভব - উপাদান প্রত্যয়ে প্রত্যয়িত স্কন্ধমুহূর্ত বর্তমান কালে কায় কর্ম, বাক্য কর্ম এবং মনো কর্ম অথবা ভবগামিক কুশলা-কুশল চেতনাকেই - ‘কর্ম-ভব’ বলা হয়।

২. উৎপত্তি ভব - ত্রি-লোকে (কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোকে) স্কন্ধ সমূহের আবির্ভাব বা পুনঃজন্মকেই - ‘উৎপত্তি ভব’ বলা হয়।

জাতি বা পুনঃজন্ম

“জননং জাতি” অর্থাৎ উৎপন্ন করে বা জনন কর্মাদি সম্পাদন করে এই অর্থেই ‘জাতি’। কুশলা-কুশলাদি কর্ম-ভবের প্রত্যয়ে যে যে ভাবে জাতি প্রত্যয়িত হয়েছে, ঠিক সে সে ভাবে মাতৃ জঠরে বা ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্ব নিকয়ে (জীব যোনীতে) স্কন্ধ সমূহের প্রাদূর্ভাব ও আয়তনাদির প্রতিলাভ করাকেই - ‘জাতি বা পুনঃজন্ম’ বলা হয়।

জরা

“জীরণং জরা” - রূপ-কায়ের জীর্ণতাই ‘জরা’। অথবা দৈহিক অক্ষমতা, পঙ্ককেশ, লোলবচর্ম, ভগ্ন দন্ত, চলনে-দর্শনে-শ্রবণে অক্ষমতা ও ইন্দ্রিয় সমূহের পরিপক্বতাকেই - ‘জরা’ বলে।

“মরন্তি এতেনাতি মরণং” - রূপ কলেবর নিক্ষেপ, চ্যুতি, স্কন্ধ সমূহের প্রভেদ ও জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদকেই ‘মরণ’ বলে।

“সোচনং সোক” - প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ ও কাম্য বস্তুর অলাভে যে চিন্তদাহ, মানসিক দুর্মনতা, অন্তশোক, অনুশোচনা ও মানসিক অশান্তিকেই - ‘শোক’ বলে।

“পরিবেদনং পরিদেবো” শোকের বলবতার কারণে বক্ষে হস্তাঘাত, উচ্চস্বরে ক্রন্দনে চৈতন্যহীন হওয়া ও কান্নায় গড়াগড়ি দিয়ে আত্ননাদ করাকেই - ‘পরিদেবন’ বলে।

“উপ্লাদ-টঠিতি বসেন বা দ্বিধা ঋণতীতি দুঃখং” - অর্থাৎ উৎপত্তি ও স্থিতিদ্বয়কে দ্বিধা বিভক্ত করে বা খনন করে বলেই ‘দুঃখ’ অথবা দৈহিক বা স্কন্ধ সমূহের পরিবর্তনশীলতা, ক্ষণ ভঙ্গুরতা ও অনিত্যতা হওয়াকেই - ‘দুঃখ’ বলে।

“দুশ্মনভাবো দোমনস্‌সনং” - দুর্মনভাব, চৈতসিক দুঃখ অথবা চিন্তের অস্বস্তিকর অবস্থাকেই - ‘দৌর্মনস্য’ বলে।

“ভূসো আয়াসো উপায়াসো” - অর্থাৎ বিবিধ ব্যসন (পরিহানি) জনিত যে অত্যাধিক নৈরাশ্য, দুর্দশা, হা-হুতাশ ও দুঃখাবস্থাকেই - ‘উপায়াস’ বলে।

দুই মূল :

অবিদ্যা ও তৃষ্ণাদ্বয়কে প্রতিত্যসমুৎপাদের মূল বলা হয়। কারণ, এই অবিদ্যা তৃষ্ণাই প্রতিত্যসমুৎপাদের জন্ম-মৃত্যুর সংসরণ চক্রের গতিকে সুদীর্ঘায়িত ও স্থায়ীত্বতা বৃদ্ধি করে থাকে। অবিদ্যা দুঃখ সত্যকে জানতে দেয়না আর তৃষ্ণা দুঃখ সত্যকে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বৃদ্ধি করে। এভাবেই বৃক্ষের শিকর বৃক্ষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ন্যায় অবিদ্যা- তৃষ্ণাও প্রতিত্যসমুৎপাদের জন্ম-মৃত্যুর সংসরণ চক্রের গতিকে সচল ও প্রানবন্ত পূর্বক সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখে।

দুই সত্য :

প্রতিত্যসমুৎপাদে অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্ম-ভব ইহা 'সমুদয় সত্য' এবং বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা ও জন্ম, জরা-মরণাদি ইহা 'দুঃখ সত্য'।

চারি সংক্ষেপ :

অবিদ্যা ও সংস্কার ইহা - এক সংক্ষেপ।

বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা ইহা-দ্বিতীয় সংক্ষেপ।

তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্ম-ভব ইহা - তৃতীয় সংক্ষেপ।

জাতি বা জন্ম, জরা ও মরণাদি ইহা- চতুর্থ সংক্ষেপ।

ত্রি-সংযোগ :

অতীত সমুদয় সত্য সংস্কারের সাথে বর্তমান দুঃখ সত্য বিজ্ঞানের- এক সংযোগ।

বর্তমান দুঃখ সত্য বেদনার সাথে সমুদয় সত্য তৃষ্ণার-দ্বিতীয় সংযোগ।

ক্ষণ মুহূর্ত বর্তমান সমুদয় সত্যের সাথে অনাগতে দুঃখ সত্য জাতির বা জন্মের - তৃতীয় সংযোগ।

ত্রি-বর্ত :

অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদান ইহা - ক্লেশবর্ত।

সংস্কার ও কর্ম-ভব ইহা - কর্মবর্ত।

বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, জন্ম ও জরা-মরণ ইহা - বিপাকবর্ত।

ত্রি-কাল :

অতীত কাল : অবিদ্যা ও সংস্কার এই অঙ্গদ্বয় অতীত কালীক।

বর্তমান কাল : বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্ম-ভব এই অষ্টাঙ্গ সমূহ বর্তমান কালীক।

ভবিষ্যৎ কাল : জাতি বা জন্ম, জরা ও মরণ এই অঙ্গত্রয় ভবিষ্যৎ কালীক ।

বিংশতি বিষয় (কারণ ও ফল) :

অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব এই পঞ্চ বিষয় অতীত কালীক দুঃখ সমুদয় সত্যের কারণ ।

বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা এই পঞ্চ বিষয় বর্তমান কালীক দুঃখ সত্যের বিপাক ।

তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম-ভব, অবিদ্যা ও সংস্কার এই পঞ্চ বিষয় ক্ষণ মুহূর্ত বর্তমান কালীক দুঃখ সমুদয় সত্যের কারণ ।

বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা এই পঞ্চ বিষয় ভবিষ্যৎ দুঃখ সত্যের বিপাক সত্য ।

* * *

চিন্তানুপস্‌সনা বা চিন্তানুদর্শন

‘চিন্তানুপস্‌সনা’ ইহা শব্দ ত্রয়ে গঠিত একটি বিদর্শনিক শব্দ। যেমন, চিন্তা + অনু + পস্‌সনা অর্থাৎ ‘চিন্তা’ অর্থে আলম্বন গ্রহণ করে, আলম্বন জানে ও আলম্বনে রমিত হয়। ‘অনু’ অর্থ হচ্ছে পেছনে বা পশ্চাতে। আর ‘পস্‌সনা’ শব্দের অর্থ দর্শন করা বা জানা। একাধারে বলা যায় কার্য্য কারণে (আলম্বন গৃহিত হয়ে) উৎপন্ন বিজ্ঞান বা চিন্তাকে উদয়ের মহূর্ত্তে উদয় রূপে, আর বিলয়ের মহূর্ত্তে বিলয় রূপে ও অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম রূপে পঞ্চগঙ্গা মার্গ (সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি, সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প) দিয়ে দর্শন করা বা জানাই হচ্ছে - “চিন্তানুপস্‌সনা”।

চিন্তানুপস্‌সনা স্মৃতি অনুশীলনের জন্য উপযোগী চিন্তা

চিন্তানুপস্‌সনা স্মৃতি অনুশীলনের মূল উপযোগী চিন্তা মোট তের প্রকার। পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত মহাথের মোগোক ছেয়াদ সতিপট্ঠান সূত্রের সহিত সামঞ্জস্য বিধান রেখে তাঁর সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত এবং গভীরভাবে চিন্তানুপস্‌সনা স্মৃতি অনুশীলনের পদ্ধতি এই তের প্রকার চিন্তা সম্পর্কে চিন্তানুপস্‌সনা বিদর্শন ভাবনার দেশনা করেছেন। সেই তের প্রকার চিন্তা হচ্ছে- ১. শ্বাস চিন্তা, ২. প্রশ্বাস চিন্তা এই দুটি মূল চিন্তা, ৩. চক্ষু বিজ্ঞান, ৪. কণ্ঠ বিজ্ঞান, ৫. ঘ্রাণ বিজ্ঞান, ৬. জিহ্বা বিজ্ঞান, ৭. কায় বিজ্ঞান এই পাঁচটি বহিরাগত চিন্তা। ৮. লোভ চিন্তা, ৯. দ্বেষ চিন্তা, ১০. মোহ চিন্তা, ১১. অলোভ (দান) চিন্তা, ১২. অদ্বেষ চিন্তা, (মৈত্রী) চিন্তা ও ১৩. ভাব (অতীত ও ভবিষ্যতকে নিয়ে চিন্তা বা পরিকল্পনা করে এমন) চিন্তা এই ছয়টি আভ্যন্তরীণ চিন্তা।

চিন্তা উৎপত্তির স্থান ও উৎপত্তির সময় :

চিন্তানুপস্‌সনা স্মৃতি অনুশীলন কালীন সাতটি স্থানে চিন্তা উৎপন্ন হয়। যথাঃ

১. চক্ষু প্রসাদে রূপালম্বনের সংস্পর্শে চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।
২. শ্রোত্র প্রসাদে শব্দালম্বনের সংস্পর্শে শ্রোত্র বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।
৩. ঘ্রাণ প্রসাদে গন্ধালম্বনের সংস্পর্শে ঘ্রাণ বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।
৪. জিহ্বা প্রসাদে রসালম্বনের সংস্পর্শে জিহ্বা বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।
৫. কায় প্রসাদে স্পর্শালম্বনের সংস্পর্শে কায় বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।
৬. হৃদবস্তুকে আশ্রিত করে মনের মধ্যে লোভ চিত্ত, দ্বেষ চিত্ত, মোহ চিত্ত, অলোভ চিত্ত, অদ্বেষ চিত্ত ও ভাব চিত্ত উৎপন্ন হয়।
৭. শ্বাস টানতে ছাড়তে নাসিকাগ্রস্থানে বায়ু স্পর্শ হলে সেই স্পর্শিত স্থানে শ্বাস চিত্ত ও প্রশ্বাস চিত্ত উৎপন্ন হয়ে থাকে।
- ক্ষেত্র যেমন শস্য উৎপত্তির স্থান, ঠিক তেমনিভাবে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি প্রসাদেও চিত্ত উৎপত্তির স্থান।

অপরদিকে ক্ষেত্র ব্যতীত যেমন শস্য উৎপন্ন হতে পারে না, ঠিক তেমনি আলম্বন বিনাও চিত্ত উৎপন্ন হতে পারে না। মূলতঃ আলম্বনই হচ্ছে চিত্ত ও চৈতসিকের কার্য্য ক্ষেত্র। আর চিত্ত তখনই উৎপন্ন হয়, যখন দুই প্রত্যয় ধর্মের কার্য্য কারণ ঘটে। যেমন তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, “চক্ষুঃ পটিচ্চ, রূপে চ উল্লঙ্ঘতি চক্ষু বিঞ্ঞাণং” অর্থাৎ চক্ষু প্রত্যয় বা কারণ, আর রূপও প্রত্যয় বা কারণ; এই দুই প্রত্যয় বা কারণে কার্য্য হলে, কার্য্য-কারণ মহূর্তে সেখানে চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঠিক অনুরূপভাবে শ্রোত্রের সাথে শব্দের, ঘ্রাণের সাথে গন্ধের, জিহ্বার সাথে রসের, কায়ের সাথে স্পর্শের, মনের সাথে ধর্মের, শ্বাস টানতে ছাড়তে নাসিকার অগ্রস্থানে বায়ু স্পর্শ হওয়া মহূর্তে শ্বাস চিত্ত ও প্রশ্বাস চিত্ত উৎপন্ন হয়ে থাকে।

চিত্তের স্বভাব ধর্মতা :

চিত্তের স্বভাব ধর্মতা হচ্ছে কার্য্য-কারণ মুহূর্তে উদয় হয়ে বিলয় প্রাপ্ত হওয়া। যেমনঃ চিত্তের স্বভাব ধর্মতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বুদ্ধ তাঁর অভিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন “অঞ্ঞা উল্লঙ্ঘতে চিত্তং

অঞ্ঞ চিত্তং নিরুজ্জতি, অবীচি মনো সম্বন্ধো নদী সুতো ব গচ্ছতি” একটি চিত্ত উৎপন্ন হয়ে বিলয় হওয়ার সাথে সাথেই অন্য আর এক চিত্ত উৎপন্ন হয়।

এভাবে অবিচ্ছিন্ন নদী স্রোতের ন্যায় চিত্ত স্রোত প্রবাহিত হয়। একটি চিত্ত উৎপন্ন হয়ে বিলয় না হওয়া পর্যন্ত সেখানে যে অন্য আর এক চিত্ত উৎপন্ন হবে তা কখনো সম্ভব নয়। কারণ বলা হয়েছে, “এক চিত্ত সমযুস্ত” অর্থাৎ এক সময়ে একটি মাত্র চিত্ত উৎপন্ন হতে পারে; দুটি চিত্ত নহে। এভাবে প্রতিটি চিত্ত উদয়ের পর বিলয় আর বিলয়ের পর অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মতা প্রাপ্ত হয়। এখানে কারো (ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, ভগবান বা দেব-ব্রহ্মা) নির্দেশক্রমে চিত্ত উদয়ও হয়না আর বিলয়ও হয় না। প্রকৃতির প্রকৃত নিয়মে প্রত্যয়ের কার্য-কারণের দ্বারা উদয় হয়ে বিলয় ও অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মতা প্রাপ্ত হয়।

এখানে চিত্তের স্বভাব সম্বন্ধে আরো বলা হয়েছে :

১. মন দ্রুত গতিতে আসা যাওয়া করে।
২. মন সব সময় পাপে রমিত হওয়ার চেষ্টা করে।
৩. মন ঈঙ্গিত বস্তুর অলাভে ক্রুদ্ধ হয়।
৪. মন যথা লাভে সন্তুষ্ট হতে পারে না।
৫. মন যাদু করের মত।
৬. মনের কোন আকার-আকৃতি নেই।
৭. মন একাচারী।
৮. মন হৃদয় গুহায় আশ্রিত হয়ে বাস করে।

চিত্তানুপস্সনা’র স্মৃতি অনুশীলন

শ্রদ্ধাবান দুঃখ মুক্তিকামী সাধকগণকে বুদ্ধের নির্দেশিত মধ্যম পন্থাকে অনুসরণ করে চিত্তানুপস্সনা স্মৃতি অনুশীলন করা উচিত। অতি কঠোর কৃচ্ছ সাধনা ও নয়, আর অতি কামভোগের সাথেও নয়। এই দুই অন্তকে পরিত্যাগ করে সকল বুদ্ধগণের অনুশীলিত

মধ্যম প্রতিপদা মার্গানুসারে স্মৃতি অনুশীলন করা উচিত। শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, স্মৃতি অনুশীলনের পূর্বে সর্ব প্রথম আসন তৈরী করতে হবে। যেমনঃ

১. মেরুদণ্ড সোজা রাখা।

২. দৃষ্টি আড়াই হাতের ভেতরে রেখে স্বাভাবিক আসনে বসা।

৩. মাথা সোজা রাখা।

৪. বাম হাত নিচে, ডান হাত উপরে রেখে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথাকে পরস্পর লেগে রাখা।

৫. চোখ ও মুখ বন্ধ রাখা।

এভাবে আসন তৈরী করার পর সর্ব প্রথমে শ্বাস প্রশ্বাস (আনাপানা) স্মৃতি অনুশীলন করতে হবে। অর্থাৎ শ্বাস টানলে টানছি, শ্বাস টানছি বলে স্মৃতি সহকারে জানবেন; আর শ্বাস ছাড়লে শ্বাস ছাড়ছি বলে স্মৃতি সহকারে জানবেন। তাই তথাগত বুদ্ধ মহাসতিপট্ঠান সূত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস (আনাপানা) স্মৃতি অনুশীলন সম্পর্কে বলেছেনঃ-

“সোসতো বা অসুসসতি, সতো বা পসুসসতি;

দীঘং বা অসুসসন্তো দীঘং আসুসসামীতি পজানাতি।

দীঘং বা পসুসসন্তো দীঘং পসুসসামীতি পজানাতি।

রসুসং বা অসুসসন্তো রসুসং অসুসসামীতি পজানাতি।

রসুসং বা পসুস সন্তো রসুসং পসুসসামীতি পজানাতি”।

অর্থাৎ- সাধকগণ স্মৃতি সহকারে শ্বাস গ্রহণ করেন, আর স্মৃতি সহকারে শ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘ শ্বাস টানলে দীর্ঘ শ্বাস টানছি বলে স্মৃতি সহকারে জানেন, আর দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ছি বলে স্মৃতি সহকারে জানেন। হ্রস্ব-শ্বাস টানলে হ্রস্ব-শ্বাস টানছি বলে স্মৃতি সহকারে জানেন, আর হ্রস্ব-শ্বাস ছাড়লে হ্রস্ব-শ্বাস ছাড়ছি বলে স্মৃতি সহকারে জানেন।

সাধকগণের ইহাও জেনে রাখা উচিত যে, এই শ্বাস-প্রশ্বাস টানা ও ছাড়ার সময় যেন নিজের ইচ্ছায় না হয়। কারণ যদি আমরা নিজের

ইচ্ছানুযায়ী শ্বাস প্রশ্বাস টানা ছাড়া করি, তাহলে সেটা হবে স্মৃতি অনুশীলনের প্রতিকূল অবস্থা বা প্রকৃতির বিরোধীতা। এই শ্বাস-প্রশ্বাস আমরা টানিও না আর আমরা ছাড়িও না। ইহা হচ্ছে কায় সংস্কার জাত ধর্ম। এখানে কেবলমাত্র চারি ধাতুর কার্য্য কারণেই শ্বাস টানা ও শ্বাস ছাড়া হয়। নিজের ইচ্ছায় শ্বাস-প্রশ্বাসে কর্তৃত্ব করার মত কিছুই নেই। সাধকগণের কাজ হলো শুধু স্মৃতি সহকারে শ্বাস-প্রশ্বাসকে জেনে থাকা। যতক্ষণ না পর্যন্ত চিত্ত সমাহিত বা একাগ্রতা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বার বার প্রচেষ্টা করতে হবে যে, স্মৃতি যেন শ্বাস-প্রশ্বাসে নিবদ্ধ থাকে। এভাবে স্মৃতি অনুশীলন করতে করতে যদি চিত্ত স্মৃতি চ্যুত হয় অর্থাৎ অতীতকে নিয়ে চিন্তা করে বা ভবিষ্যৎকে নিয়ে পরিকল্পনা করে, তাহলে সেখান থেকে আবার ফিরে এসে শ্বাস-প্রশ্বাসে স্মৃতি স্থাপন করুন। শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, এভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসে স্মৃতি অনুশীলন করতে করতে যখন দেখবেন যে, স্মৃতি গভীর থেকে গভীরতর হতে হতে সমাধি পরিপক্ব হচ্ছে, অর্থাৎ চিত্ত সমাহিত বা একাগ্রতা হচ্ছে; তখন সাধকগণের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্মৃতি অনুশীলন করতে হবে। এখানে সাধকগণের শ্বাস টানা ছাড়ার স্মৃতি অনুশীলন স্থানে শ্বাস-প্রশ্বাসে উৎপন্ন চিত্তকে উদয় বিলয় রূপে দর্শন বা জানতে হবে। অর্থাৎ পূর্বের ন্যায় শ্বাস টানলে টানছি ও শ্বাস ছাড়লে ছাড়ছি বলে জানতে হবে না। এখন শুধুমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসে উৎপন্ন চিত্তকে উদয় বিলয়রূপে দর্শন বা জেনে জেনে থাকবেন। কারণ পূর্বেরটা হচ্ছে সমাধি (শমথ) ভাবনা আর বর্তমান শ্বাস-প্রশ্বাসে উৎপন্ন চিত্তকে উদয় বিলয় রূপে দর্শন বা জানা হচ্ছে বিদর্শন ভাবনা। বুদ্ধের নির্দেশিত বিদর্শন ভাবনার অনুশীলন উদয় বিলয় থেকে আরম্ভ করতে হয়। কারণ, বুদ্ধ চিত্তানুপস্‌সনাতে বলেছেন “সমুদয় ধম্মানুপস্‌সী বা চিত্তস্মিং বিহরতি। বয় ধম্মানুপস্‌সী বা চিত্তস্মিং বিহরতি। সমুদয় বয় ধম্মানুপস্‌সী বা চিত্তস্মিং বিহরতি।” অর্থাৎ- চিত্ত সমুদয় বা উদয় হলে, সেই সমুদয়ধর্মী চিত্তকে সমুদয় বা

উদয়রূপে দর্শন করা আর বিলয়ধর্মী চিত্তকে বিলয়রূপে দর্শন করা । এভাবে সমুদয় ও বিলয়ধর্মী চিত্তকে উদয়-বিলয়রূপে দর্শন করেই সাধক চিত্তানুপস্‌সনা স্মৃতি অনুশীলন করে বিহার বা অবস্থান করেন । শ্বাস টানার সময় নাসিকার অগ্রস্থানে বায়ু স্পর্শ হয়, সে বায়ু স্পর্শিত স্থানে শ্বাস চিত্ত উৎপন্ন হয়; আর শ্বাস ছাড়ার সময়ও নাসিকার অগ্রস্থানে বায়ু স্পর্শ হয়; সে বায়ু স্পর্শিত স্থানে প্রশ্বাস চিত্ত উৎপন্ন হয়ে থাকে । এই শ্বাস-প্রশ্বাসে উৎপন্ন চিত্ত তার স্বভাব ধর্মতা অনুসারে উদয়ের পর বিলয় প্রাপ্ত হয় । সাধকগণের উচিত, সে শ্বাস-প্রশ্বাসে উৎপন্ন চিত্তকে উদয়-বিলয়রূপে দর্শন বা জেনে জেনে স্মৃতি অনুশীলন করা । যতক্ষণ না পর্যন্ত চিত্তকে পরিষ্কার ভাবে উদয়-বিলয়রূপে দর্শন করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বার বার চেষ্টা করতে থাকুন চিত্তের উদয়-বিলয়কে দর্শন করার জন্য । এক সময় অবশ্যই উদয় বিলয় দর্শন হবে । গুরুকে খোঁজতে হলে যেমন গুরুও পদচিহ্নকে অনুসরণ করতে হয় ঠিক তদনুরূপভাবে উদয়-বিলয় দর্শন করার জন্য চিত্তের পশ্চাতে পশ্চাতে স্মৃতি দিয়ে দর্শন করতে হবে । শ্রদ্ধাবান সাধকগণের আরো জেনে রাখা উচিত যে, এই বিদর্শন ভাবনায় চিত্ত দুই প্রকার । যেমনঃ ১. মরা বা মৃত চিত্ত ২. জীবিত চিত্ত । অর্থাৎ উদয় ও বিলয় হয়ে যাওয়া এক প্রকার চিত্ত আর সেই উদয়-বিলয় চিত্তকে দর্শন করে এমন আর এক প্রকার চিত্ত । মনে করেন, এক চিত্ত উৎপন্ন হয়েছে, সেই চিত্তের স্বভাব হচ্ছে উৎপত্তি ও বিলয় প্রাপ্ত হওয়া । বিলয় প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হল মরে যাওয়া বা মৃত্যু হওয়া । সেই মৃত চিত্তকে আর একটা জীবিত চিত্ত দর্শন করে । যে জীবিত চিত্ত মৃত চিত্তকে দর্শন করে, তাকে মার্গ জ্ঞান বা মার্গ সত্য বলা হয় । প্রথম চিত্তের উদয় বিলয়কে যে দ্বিতীয় জীবিত চিত্ত দিয়ে দর্শন করাকে বিদর্শন বলা হয় । যে বিদর্শন ভাবনা সকল বুদ্ধগণের অনুশীলিত ও “একায়নো অযং ভিক্ষবে মগ্‌গো সত্তানং বিসুদ্ধিয” বলে প্রশংসিত । শ্রদ্ধাবান সাধকগণের এভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসে উৎপন্ন চিত্তকে উদয়-বিলয় রূপে

স্মৃতি অনুশীলন করতে করতে যদি চক্ষু প্রসাদ ধাতুতে রূপালম্বন-সংস্পর্শ হয়ে, 'চক্ষু বিজ্ঞান' উৎপন্ন হয়, তাহলে শ্বাস-প্রশ্বাসে স্মৃতি অনুশীলন না করে তৎমহূর্তে উৎপন্ন চক্ষু বিজ্ঞানকে উদয় বিলয় রূপে দর্শন বা জানতে হবে। চক্ষু বিজ্ঞানকে উদয় বিলয় রূপে দর্শন করে, চিত্ত অনিত্যতা প্রাপ্ত হওয়ার পর যদি অন্য আয়তনে (দ্বারে) বিজ্ঞান বা চিত্ত উৎপন্ন না হলে, তাহলে পুনঃপ্রাণ শ্বাস-প্রশ্বাসে উৎপন্ন চিত্তকে স্মৃতি অনুশীলন করুন। ঠিক অনুরূপভাবে শ্রোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান ও মন থেকে উৎপন্ন লোভ চিত্ত, দ্বেষ চিত্ত, মোহ চিত্ত, অলোভ চিত্ত (দান চিত্ত) অদ্বৈত চিত্ত (মৈত্রী চিত্ত) এবং ভাব (অতীত ও ভবিষ্যৎকে নিয়ে চিন্তা করা, পরিকল্পনা করা বা অনুশোচনা করা) চিত্ত উৎপন্ন হলে সেই উৎপন্ন চিত্তকে উদয় বিলয় রূপে দর্শন করুন। শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, চিত্তানুপস্ফনার উপযোগী এই ১৩টি চিত্ত যে, একসাথে উৎপন্ন হবে তা কখনো সম্ভব নয়। কারণ, চিত্তের ধর্মতা (প্রকৃতি) হচ্ছে 'এক চিত্ত সময়স্তা' এক সময়ে একটি চিত্তই উৎপন্ন হতে পারে। সেই উৎপন্ন চিত্ত যতক্ষণ না পর্য্যন্ত বিলয় প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য আরেক চিত্ত উৎপন্ন হতে পারেনা। যেমনঃ উপমার স্বরূপ বলা যায় একটি চেয়ারে বা আসনে কেবলমাত্র এক জনই বসতে পারে। সেই চেয়ারে বসে থাকা ব্যক্তিটি যতক্ষণ না উঠবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য আরেকজন বসতে পারে না।

যখন ঐ ব্যক্তি চেয়ার থেকে উঠে পড়বে, তখন সেই চেয়ারে অন্যআরেক জন বসতে পারে। ঠিক তদ্রূপ এই ষড়ায়তন ও হচ্ছে বিজ্ঞান বা চিত্ত উৎপত্তির স্থান বা ক্ষেত্র। এই স্থানে (ষড়ায়তনে) প্রতিমহূর্তে একচিত্ত উৎপন্ন হয়ে বিলয় প্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে অন্য আরেক চিত্ত উৎপন্ন হচ্ছে। এভাবে একও নয়, ভিন্নও নয়, রূপে চিত্ত ও চৈতসিকের প্রবাহ অবিরতভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। তাই এই উদয়-বিলয় প্রাপ্ত হওয়া চিত্তকে দর্শন করে করেই ত্রি-লক্ষণ (অনিত্য, দুঃখ ও অনত্মা) জ্ঞানকে বর্ধিত ও শক্তিশালী করার

জন্য প্রত্যেক সাধকগণের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। শ্রদ্ধাবান সাধকগণের বিদর্শন ভাবনার মূল গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার। যদি ইহা জানা না থাকে, তাহলে কোথায়, কখন, কাহাকে ও কীভাবে স্মৃতি অনুশীলন করতে হয়, তাহা জানা সম্ভব হবেনা। যার ফলে চিত্তানুপস্সনা বিদর্শন ভাবনার অনুকূল স্মৃতি অনুশীলন হবেনা। আর সেখানে যথার্থ স্মৃতি অনুশীলন না হওয়াতে, সেখানে কখনো বিদর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হবে না। তাই শুধু শুধু বসে থাকা হবে মাত্র। বিদর্শন ভাবনার সেই চারটি মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে :

১. স্থান - বিদর্শন ভাবনা চিত্তানুপস্সনার স্মৃতি অনুশীলন করার স্থান হচ্ছে সাতটি। যেমনঃ ১. চক্ষু প্রসাদে ২. শ্রোত্র প্রসাদে ৩. ঘ্রাণ প্রসাদে ৪. জিহ্বা প্রসাদে ৫. কায় প্রসাদে ৬. হৃদবস্তুতে এবং ৭. শ্বাস-প্রশ্বাসে।

২. কাল - কার্য-কারণে চিত্ত উৎপন্ন হওয়ার মুহূর্ত সময়ে ও চিত্ত বিলয় হওয়ার মুহূর্ত সময়ে স্মৃতি অনুশীলন করা। অতীত ও ভবিষ্যতকে নিয়ে স্মৃতি অনুশীলন করা যায় না। ক্ষণ মুহূর্ত বর্তমান কালে স্মৃতি অনুশীলন করতে হয়।

৩. বিষয় - বিদর্শন ভাবনা স্মৃতি অনুশীলনের মূল আলম্বন (চিত্ত) পূর্বে বর্ণিত চিত্তানুপস্সনা স্মৃতি অনুশীলনের সেই ১৩ টি চিত্ত। সেই ১৩ প্রকার চিত্তের মধ্যে যে চিত্ত উৎপন্ন হউক না কেন, সেই উৎপন্ন চিত্তকে স্মৃতি অনুশীলন করা।

৪. দর্শন - পূর্বোক্ত ১৩ প্রকার চিত্তের মধ্যে যে চিত্ত উৎপন্ন হউক না কেন, সকল চিত্তকে উদয় বিলয় রূপে দর্শন করা।

শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, পঞ্চক্ষক বা নাম-রূপ উদয়-বিলয়ের অর্থ হল 'জন্ম ও মরণ' এই জন্ম ও মরণকে দুঃখ সত্য বলা হয়। সে জন্ম ও মরণকে যে চিত্ত দর্শন করে, তাকে মার্গ জ্ঞান বা মার্গ সত্য বলা

হয়। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, মার্গ সত্য দ্বারা দুঃখ সত্যকে দর্শন করাই বিদর্শন ভাবনা। অনেকে মনে করেন যে, পাহাড়ে-পর্বতে, গুহার অভ্যন্তরে ও গভীর অরণ্যে গিয়ে কিংবা শ্মশানে গিয়ে বিদর্শন ভাবনা করতে পারলেই তবে বিদর্শন ভাবনা হয়। এরূপ ধারণা করা কিন্তু অত্যন্ত ভুল। কারণ, বিজ্ঞান বা চিন্তের উৎপত্তি ও বিনাশ এই নাম-রূপ বা পঞ্চস্কন্ধের মধ্যেই আছে। আবার চিন্তের উৎপত্তি ও বিনাশকে যে চিন্তা দর্শন করে, তাহাও নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের মধ্যেই আছে। তাই এই পঞ্চস্কন্ধকে ভিত্তি করে বিদর্শন ভাবনার স্মৃতি অনুশীলন করতে হয়। পাহাড়ে, পর্বতে, গুহায়, অরণ্যে বা শ্মশানে ভিত্তি করে নয়। তবে এটা বলে রাখা ভালো যে, নিরিবিলা বা অন্তরায় মুক্ত জায়গার জন্য অরণ্যে, গুহায়, শ্মশানে যাওয়া দোষের নয়। তাই শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, এখানে স্পষ্ট যে পঞ্চস্কন্ধই হচ্ছে বিদর্শন ভাবনার কেন্দ্রস্থল। তাই তথাগত বুদ্ধ ধম্মপদে সহস্রবর্গে বলেছেন :

“যো চ বস্‌স সতং জীবে অপস্‌সং উদযং বযং,
একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো উদয বযং”।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পঞ্চস্কন্ধের উদয় বিলয় দর্শন না করে শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা পঞ্চস্কন্ধের উদয় বিলয় দর্শন কারীর এক দিনের জীবনও শ্রেয়। শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, তথাগত বুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধ বা নাম-রূপকে উদয়-বিলয় রূপে দর্শনের জন্য কেন এত প্রশংসা করেছেন? কারণ, পঞ্চস্কন্ধকে উদয়-বিলয় রূপে দর্শন করতে না পারলে সেখানে ক্ষণ মুহূর্ত বর্তমান কালে অবিদ্যা উৎপন্ন হয়। আর যখন অবিদ্যা উৎপন্ন হবে, তখন কার্য-কারণে নাম-রূপ বা পঞ্চস্কন্ধকে দুঃখ সত্য রূপে পরিজ্ঞাত হতে সক্ষম হয় না। অবিদ্যা উৎপন্ন হওয়ার কারণে, উৎপন্ন আলম্বনকে উদয়-বিলয়, অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপে দর্শন করতে সক্ষম হয় না। যার ফলে সেখানে কর্ম সম্পাদন করা হয়। আর যখন কর্ম সম্পাদিত হবে,

তখন সেই সম্পাদিত কর্মের শক্তি সংস্কার রূপে চিত্ত সত্ততিতে অনুশয় আকারে কর্ম বিপাকের হেতু রূপে প্রবাহিত হয়ে থাকে। তাই নাম-রূপ বা পঞ্চস্কন্ধ সংস্কার ধর্ম সমূহকে উদয় বিলয় রূপে দর্শন করাতে সক্ষম না হওয়াতে সেখানে ক্লেশবর্ত (অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদান) উৎপন্ন হয়। আর যখন ক্লেশবর্ত উৎপন্ন হবে, তখন সেখানে কর্মবর্ত (সংস্কার ও কর্ম-ভব) উৎপন্ন হয়। যখন কর্মবর্ত উৎপন্ন হবে, তখন সেখানে অনাগতে বিপাকবর্ত (বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা) উৎপন্ন হওয়ার হেতু হয়। এভাবে জন্ম-জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি সমস্ত দুঃখ স্কন্ধের প্রবাহ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, ইহা কিসের কারণে বা হেতুতে হয়েছে? কেবলমাত্র এই নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের সংস্কার সমূহকে উদয় বিলয় রূপে দর্শন করতে না পারার কারণে উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু অপরপক্ষে সাধক নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের সংস্কার সমূহকে উদয় বিলয় রূপে দর্শন করতে সক্ষম হওয়ার ফলে তাঁহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যখন জ্ঞান উৎপন্ন হবে, তখন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা রূপে দর্শন করে ত্রি-লক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হবে। যার ফলে, সেখানে ক্লেশ উৎপন্ন হতে পারে না। আর ক্লেশ উৎপন্ন হতে না পারার কারণে, সেখানে কর্ম সম্পাদিত হয় না। কর্ম সম্পাদিত না হওয়াতে সেখানে অনাগতে বিপাকবর্ত উৎপন্ন হওয়ার হেতু হয় না। এভাবে জন্ম-জরা, ব্যাধি, মরণ ইত্যাদি সমস্ত দুঃখ স্কন্ধের প্রবাহ সংযোজন সেখানে ছিন্ন বা ছেদন হয়ে যায়। এই কারণে তথাগত বুদ্ধ নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের ধর্ম সমূহকে উদয় বিলয় রূপে দর্শনকারীদের প্রশংসা করেছেন। শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, এই চিত্তানুপস্সনা স্মৃতি অনুশীলন অবিচ্ছিন্ন রূপে করার লক্ষ্যে তথাগত বুদ্ধ তিন পর্যায়ে স্মৃতি অনুশীলনের কথা বলেছেন। যেমনঃ

১. বসা স্মৃতি অনুশীলন।
২. চংক্রমণ স্মৃতি অনুশীলন।
৩. সম্প্রজ্ঞান স্মৃতি অনুশীলন।

শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, বস্মা স্মৃতি অনুশীলন সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখন কেবলমাত্র চংক্রমণ ও সম্প্রজ্ঞান স্মৃতি অনুশীলন সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হবে।

চংক্রমণ

সাধনার পথে সাধককে অগ্রসর হওয়ার সময় ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে যখন যে দ্বারে পতিত যে আলম্বনটি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট (প্রকট) হয়, তখন সে আলম্বনের স্বভাবকে সম্যক্ ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য সাধকের অনুক্ষণ স্মৃতি সাধনায় ডুবে থাকতে হবে। স্মৃতি সহকারে পায়চারি বা গমনাগমন করাকে ‘চংক্রমণ’ স্মৃতি অনুশীলন বলা হয়। যেটা চরি ঈর্ষ্যাপথের মধ্যে একটি এই চংক্রমণ। শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, চংক্রমণ স্মৃতি অনুশীলনের পূর্বে প্রথমতঃ স্থান নির্বাচন করতে হবে। অর্থাৎ- চংক্রমণ স্মৃতি অনুশীলনের অনুকূল এমন ৯ (নয়) হাত পরিমান স্থান নির্বাচন করা।

দ্বিতীয়তঃ দৃষ্টি যেন ৪ (চার) হাতের ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকে এভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ধাতু পর্যবেক্ষণ করা। তৃতীয়তঃ পায়ের তালুতে স্মৃতি স্থাপন করা। চতুর্থতঃ বায়ু জনিত চিত্তকে পর্যবেক্ষণ করা। পঞ্চমতঃ পাদ চালনায় স্মৃতি স্থাপন করা। যেমনঃ পায়ের তলে চারটি স্থান সহ মাটি থেকে পা শূন্যে তোলা, শূন্যে পদ চালনা করা এবং মাটির দিকে পা নত করা এই সাতটি স্থানে স্মৃতি অনুশীলন করা। পদতলের চারটি স্থান হল মুড়ি, ফুলা, আঙ্গুল ও নিভা। এই চারটি স্থানে পা তোলার সময় ও পা মাটিতে রাখার সময়, মাটির সাথে সংস্পর্শে উক্ত চারি স্থানে স্পর্শ চিত্ত উৎপন্ন হয়। এই চারটি হচ্ছে স্পর্শ জনিত চিত্ত, আর অপর তিনটি হচ্ছে বায়ু জনিত চিত্ত। এই সাতটি স্তরে যে চিত্ত উৎপন্ন হউক না কেন সকল চিত্তকে উদয় বিলয় রূপে দর্শন করতে হবে। এভাবে চংক্রমণ স্মৃতি অনুশীলন করতে করতে যদি হঠাৎ শব্দারম্ভন সংস্পর্শ হয়ে কর্ণ বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহলে সে মহুর্তে চংক্রমণ না করে কর্ণ বিজ্ঞানকে স্মৃতি দ্বারা

জানতে হবে। উৎপন্ন কর্তৃক বিজ্ঞানকে স্মৃতির দ্বারা উদয় বিলয় রূপে জানার পর পুনঃপ্রায় চংক্রমণ স্মৃতি অনুশীলন করুন। ঠিক তদ্রূপভাবে দ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান, মনেতে উৎপন্ন লোভ চিত্ত, দ্বেষ চিত্ত, মোহ চিত্ত, অলোভ চিত্ত, অদ্বেষ চিত্ত ও ভাব চিত্ত সম্পর্কে সেরূপ ভাবে জানতে হবে। সবশেষে সম্প্রজ্ঞান স্মৃতি অনুশীলন বিষয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে।

সম্প্রজ্ঞান

শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, বস্তু স্মৃতি অনুশীলন ও চংক্রমণ স্মৃতি অনুশীলন ব্যতীত যাহা কিছু শারীরিক কার্য সম্পাদন করা হয়, তা সর্ব ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন রেখে স্মৃতি অনুশীলন করাই হচ্ছে সম্প্রজ্ঞান স্মৃতি অনুশীলন। যেমন—

- (ক) স্মৃতি সহকারে ঘুম থেকে উঠা।
- (খ) স্মৃতি সহকারে মলত্যাগ ও প্রসাব কৃত্যাদি সম্পাদন করা।
- (গ) স্মৃতি সহকারে স্নান কার্য সম্পাদন করা।
- (ঘ) স্মৃতি সহকারে আহার গ্রহণ করা।
- (ঙ) স্মৃতি সহকারে শয়্যাসন গ্রহণ করা।

যেমন তথাগত বুদ্ধ মহাসতিপট্টান সূত্রে সম্প্রজ্ঞান স্মৃতি অনুশীলন সম্বন্ধে বলেছেন— “পুন চ পরং ভিক্ষবে ভিক্ষু অভিক্ষন্তে পটিক্সন্তে সম্পজানকারী হোতি। আলোকিতে বিলোকিতে সম্পজানকারী হোতি। সমিঞ্জিতে পসারিতে সম্পজানকারী হোতি। সংঘাটি পত্ত-চীবর ধারণে সম্পজানকারী হোতি। অসিতে, পীতে, খাযিতে, সাযিতে সম্পজানকারী হোতি। উচ্চার পস্সাব কন্মে সম্পজানকারী হোতি। গতে, ঠিতে, নিসিন্বে, সুত্তে, জাগরিতে, ভাসিতে, তুণ্হীভাবে সম্পজানকারী হোতি।

অর্থাৎ— পুনশ্চ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু গমনে, প্রত্যাবর্তনে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলনকারী হন; অবলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে, আহারে, পানে, ভোজনে, আশ্বাদনে,

শরীরকৃত্য সম্পাদনে, পতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে ভাষণে, নীরবতায় সম্প্রজ্ঞান বিশেষভাবে সতর্ক অনুশীলন করেন। যেমনঃ বুদ্ধ আরো বলেছেন- “ইধ ভিক্ষবে ভিক্ষু! একাচ্চো পুণ্নলো সৰ্ব্ব সজ্জারেসু অনিচ্চানুপসসী বিহরতি অনিচ্চা সঞ্ঞী অনিচ্চং পটিসংবেদী সততং সযিতং অব্বো কিনং চেতসা অধিমুত্ত মানো পঞ্ঞান পবিযোগারামানো। যো আসবং যো অনাসবং চেতো বিমুত্ত পঞ্ঞা বিমুত্তি দিট্ঠেব ধম্মে মযং অভিঞ্ঞা সচ্চি কত্তা উপসম্পজ্জ বিহরতি।”

অর্থাৎ- যে যোগীগণ সম্প্রজ্ঞানে নির্ভুলভাবে চিত্তানুপসসনা বা চিত্তানুদর্শন নিয়ে জীবন যাপন করেন এবং সম্যক্ দৃষ্টি দিয়ে ধারণ করেন, যে জাগরিত সব কিছুই পর পর দুই মহূর্তে জন্য একই রকম অবস্থায় থাকেনা। এভাবে স্মৃতি অনুশীলনকারী যোগীগণ কেবলমাত্র অনিত্য জ্ঞানে কোন ক্লেশ ছাড়া সমস্ত আসব হতে মুক্ত হয়ে এই জনেই নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হবেন।

“চিত্তানুপসসনার দ্বারা দৃষ্টি গ্রহণ”

উচ্ছেদ দৃষ্টি :

শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, উচ্ছেদ দৃষ্টি ও উচ্ছেদবাদী সম্পন্ন ব্যক্তি এরূপ মত বা এরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন, যেহেতু এই আত্মারূপী, চতুর্মহাভূতিক, মাতা-পিতা, হইতে সম্মত বা জাত, সেই হেতু দেহাবসানে ইহার উচ্ছেদ বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; মরণের পর ইহার অস্তি ত্ব থাকে না, উহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন। উপরন্তু কেহ কেহ এরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন যে, জগতে সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্মের পরিণামে কোন বিপাক বা ফল নাই। ইহলোকে যাহা থাকে, পরলোকে তাহা নাই। স্বর্গ, ব্রহ্ম ঔপপাতিক সত্ত্ব বলতে কিছুই নাই। এভাবে সবকিছু উচ্ছেদ ধারণা করাই হচ্ছে উচ্ছেদ দৃষ্টি। যেমন দীর্ঘ নিকায়ের ‘পায়াসী সূত্রে’ পায়াসী রাজা এই উচ্ছেদ দৃষ্টি সম্পন্ন

ছিলেন। শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, অপর পক্ষে একজন বিদর্শন সাধক, বিদর্শন ভাবনা স্মৃতি অনুশীলনের পূর্বে কল্যাণমিত্রের কাছ থেকে শ্রুতময় জ্ঞানে স্বক, আয়তন, ধাতু, সত্য ও প্রতিত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনে নিয়ে বিদর্শন ভাবনা স্মৃতি অনুশীলন করেন। এভাবে অনুক্ষণ বিদর্শন ভাবনায় স্মৃতি অনুশীলন করতে করতে তাহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিনিয়ত নাম-রূপ সংস্কার ধর্ম সমূহ উদয় হচ্ছে আর বিলয় হচ্ছে। কিসের কারণে উদয় হচ্ছে? তাহার দৃষ্টি গোচরক হয় কেবলমাত্র কার্য কারণে নাম-রূপ উদয় হচ্ছে। সাধকের আরও প্রতীয়মান হয় যে, অতীতে পঞ্চহেতু (অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্মভব) বা সমুদয় সত্যের কারণে বর্তমান পঞ্চফল (বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, ও বেদনা) দুঃখ সত্যের উৎপত্তি। আর বর্তমান পঞ্চহেতু (তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম-ভব, অবিদ্যা ও সংস্কার) সমুদয় সত্যের কারণে, অনাগতে পঞ্চফল (বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা) দুঃখ সত্যের উৎপত্তি ঘটবে। এভাবে যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সমুদয় সত্য ক্লেশবর্ত ও কর্ম বর্তের গ্রহণ করা না হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বার বার এই দুঃখ সত্যের উৎপত্তি বা আবির্ভাব ঘটবে। ক্লেশ ও কর্মের শক্তি বিদ্যমান থাকলে, বার বার জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হবে। ইহা দর্শনের ফলে সাধকের উচ্ছেদ দৃষ্টি গ্রহণ ঘটে।

শাশ্বত দৃষ্টি :

শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, শাশ্বত দৃষ্টি ও শাশ্বতবাদী সম্পন্ন ব্যক্তি এরূপ মত বা দৃষ্টি পোষণ করেন যে, জগৎ নিত্য ও শাশ্বত, আত্মা নিত্য ও শাশ্বত, আমি আত্মা, আত্মাই আমি আত্মা চিরন্তন, আত্মার মরণ নাই, আত্মা অমর, আত্মা শুধু রূপ বদলিয়ে বদলিয়ে থাকে। অপরপক্ষে একজন বিদর্শন সাধক, বিদর্শন ভাবনা স্মৃতি অনুশীলন কালীন তাহার এরূপ দৃষ্টিগোচর হয় যে, আধ্যাত্মিক ষড়ায়তন ও বাহ্যিক ষড়ালম্বন এই দুয়ের সংস্পর্শে প্রতিমহূর্তে পঞ্চস্বক বা নাম-রূপ সংস্কার ধর্ম সমূহ উদয়-বিলয় প্রাপ্ত হচ্ছে। এভাবে প্রতিনিয়ত নাম-রূপ সংস্কার

ধর্ম সমূহ অনিত্যতার স্বীকার হচ্ছে। আশ্রয় নেওয়ার মত বা নির্ভর করার মত যা এক পলক ও এক মুহূর্তও সময় নেই। এভাবে সম্যক রূপে দর্শনের ফলে, সাধকের অনিত্যতা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যার ফল শ্রুতিতে তাহার নিত্য সংজ্ঞা ও শ্বাশত সংজ্ঞা প্রহাণ হয়ে থাকে। এভাবে সাধক বিদর্শন স্মৃতি অনুশীলন দ্বারা বিলয় ও অনিত্যতা উপলব্ধিতে তাহার শাশ্বত দৃষ্টি সমূলে ছেদন বা প্রহাণ করে থাকেন।

মিথ্যাদৃষ্টি :

দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত এই মিথ্যাদৃষ্টি। যেমনঃ ‘মিথ্যা’ + ‘দৃষ্টি’ এখানে ‘মিথ্যা’ অর্থে বুঝানো যাচ্ছে ভুল, ভ্রান্ত, অযথার্থ বিপরীত ও অসত্য। আর ‘দৃষ্টি অর্থ’ হচ্ছে ধারণা করা, বিশ্বাস করা ও মনে করা। এক অর্থে বলা যায় মিথ্যা দৃষ্টির অর্থ হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণা, মিথ্যা বা ভুল বিশ্বাস বা অসত্যকে সত্যরূপে মনে করা। সেই জন্য তথাগত বুদ্ধ মিথ্যা দৃষ্টিকে ‘দৃষ্টি বিপ্রলাস’ রূপে আখ্যায়িত করেছেন। দৃষ্টি বিপ্রলাস সম্পন্ন ব্যক্তি মনে করেন যে, এই নাম-রূপ সংস্কার ধর্ম সমূহ নিত্য, সুখ, আত্মা ও শুভ। কারণ, যেহেতু তিনি কখনো বিদর্শন ভাবনা স্মৃতি অনুশীলন করেননি, সেই হেতু এই পঞ্চস্কন্ধ বা দেহ-মনকে নিত্য, সুখ, আত্মা ও শুভরূপে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে থাকেন। কিন্তু অপরদিকে একজন বিদর্শন সাধক, বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করা কালীন তাহার এরূপ জ্ঞান দর্শন দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, দুই প্রত্যয় ধর্মের কার্যকারণে প্রতি মুহূর্তে নাম-রূপ সংস্কার ধর্ম সমূহ উদয় হয়ে বিলয় প্রাপ্ত হচ্ছে। সাগর মহাসাগরের বুকে ঢেওয়ার প্রবাহ যেভাবে একটার পর একটা উৎপন্ন ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেভাবে নাম-রূপ সংস্কার ধর্মের প্রবাহ কার্য কারণে উৎপন্ন হয়ে বিলয় প্রাপ্ত হয়, এরূপে অবিচ্ছিন্ন ও অবিশ্রান্তভাবে নাম-রূপ ধর্ম সমূহ অনিত্যতা প্রাপ্ত হচ্ছে। এভাবে নাম-রূপ সংস্কার ধর্ম সমূহের উদয় বিলয় সম্যকভাবে দর্শনের ফলে সাধকের অনিত্যতা জ্ঞান উপলব্ধি হয়। অনিত্যতা উপলব্ধির কারণে, সাধকের নিত্য নামক ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়। যাহা অনিত্য তাহা কখনোসুখ হতে পারে না। অথবা সুখের কারণও

হতে পারে না। তাই প্রতিনিয়ত দুঃখই উৎপন্ন হচ্ছে। ইহা দর্শন বা উপলব্ধির ফলে, সাধকের দুঃখময়তা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যার ফলে সুখ নামক ভ্রান্ত ধারণা সমূলে দূরীভূত বা প্রহাণ হয়। যাহা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরীত নামধর্মী, তা কারোর হতে পারে না। আমিও নয়, আমারও নয় এবং আমার আত্মাও নয়। কারণ, নাম-রূপ সংস্কার ধর্ম সমূহ আমার ইচ্ছায় উৎপন্ন হয়না, আর আমার ইচ্ছায় বিলয় হয়না। তাহা প্রকৃতির প্রকৃত নিয়মের কার্য্য কারণে উৎপন্ন হয়ে আপন গতিতে বিলয় প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এরূপ দর্শনের ফলে, অনাত্মা (যাহা আমার ও অপরের নিয়ন্ত্রিত হয়না এমন) জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এরূপ অনাত্মা জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার কারণে, সাধকের পূর্বে আত্মা নামক ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল বিশ্বাস সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হয়। এভাবে সাধক, সাধনার পথে অগ্রসর হতে হতে আদীনব জ্ঞান (নাম-রূপের প্রতি দোষ দর্শন জ্ঞান) ও নির্বেদ (নাম-রূপের প্রতি অনিহা ও বিরক্তি বোধ) জ্ঞানে নাম-রূপ সংস্কার ধর্ম সমূহকে উদয়-বিলয় ও অনিত্য, দুঃখ অনাত্মা ধর্ম সমূহকে অশুভ রূপে দর্শন করেন। যার ফলে, পূর্বে শুভ নামক ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল বিশ্বাস সাধকের প্রহাণ হয়ে যায়। যেমন বুদ্ধ সংযুক্ত নিকায়ের চতুর্থ খন্ডে নন্দিয় যক্ষ বর্গে জনৈক ভিক্ষু কিভাবে জ্ঞাত হলে, কিভাবে দর্শন করলে, মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়? এমন প্রশ্নের উত্তরে তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, হে ভিক্ষু! চক্ষুকে অনিত্য রূপে জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। চক্ষু বিজ্ঞানকে অনিত্য রূপে জ্ঞাত হলে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। চক্ষু সংস্পর্শকে অনিত্য রূপে জ্ঞাত হলে বা দর্শন করলে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। চক্ষু সংস্পর্শ হেতু যে সুখ দুঃখ ও অদুঃখ-অসুখ বেদনাকে অনিত্যরূপে জ্ঞাত বা দর্শন করলে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সম্পর্কে ও এরূপে জ্ঞাতব্য। হে ভিক্ষু! এভাবে জ্ঞাত হলে বা দর্শন করলে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ হয়ে থাকে।

* * *

বেদনানুপস্সনা বা বেদনানুদর্শন

‘বেদনানুপস্সনা’ শব্দটি ‘বেদনা’ ‘অনু’ এবং ‘পস্সনা’ এই শব্দদ্বয়েই গঠিত। ‘বেদনা’ অর্থ বেদনা বা অনুভূতি; ‘অনু’ ইহা উপসর্গ বিশেষ শব্দরূপ আর ‘পস্সনা’ অর্থ দর্শন করা বা যথাভূতভাবে জানা। সুতরাং, “বেদনানুপস্সনা” মূল শব্দের অর্থ হচ্ছে বেদনার প্রকৃত স্বভাব ধর্ম উদয়-বিলয় ও অনিত্যতাকে মার্গ দ্বারা যথাভূতভাবে দর্শন করা বা জানা।

বেদনানুপস্সনা ভাবনা অনুশীলনকারী সাধক বা যোগীগণের পক্ষে সবচাইতে ভালো হয় যদি ভাবনা অনুশীলন করার পূর্বে বেদনানুপস্সনার বিষয়ে কতগুলো প্রশ্নের স্বচ্ছ ধারণা থাকে। যেমনঃ- ১. বেদনা কি? ২. কিসের কারণে বেদনা উৎপন্ন হয়? ৩. কোন্ কোন্ স্থানে বেদনা উৎপন্ন হয়? ৪. বেদনার স্বভাব ধর্ম কি? ৫. বেদনার নিরোধে তৃষ্ণা কিভাবে নিরোধ হয়?

উপরোক্ত পাঁচটি প্রশ্নের প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার পর পরবর্তীতে বেদনানুপস্সনার বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

বেদনা কি?

বেদনা মূলতঃ এটি একটি মানসিক অনুভূতি যার দ্বারা সত্ত্ব-জীবগণ সুখ-দুঃখাদি অনুভব করে থাকে। বেদনা তিন প্রকার। যথাঃ সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা। যদিওবা সম্মুতি সত্যানুযায়ী বলা হয়, আমিই সুখ-দুঃখাদি অনুভব করি। কিন্তু পরমার্থ সত্যানুযায়ী আমি, তুমি বা কেউ সুখ-দুঃখাদি অনুভব করি না - কেবলমাত্র বেদনাই সুখ-দুঃখাদি অনুভব করে। বেদনানু-পস্সনার সাধকগণের জেনে রাখা ভালো যে, পরমার্থ সত্য (প্রকৃত সত্য বা যেটা যেরূপ সেটা সে ভাবে জানার সত্য) জ্ঞান লাভ করতে হলে পরমার্থ সত্যকেই অবলম্বন করতে হবে সম্মুতি সত্যকে নয়।

কিসের কারণে বেদনা উৎপন্ন হয়?

কোন কিছু অকারণে উৎপন্ন হয় না, সব কিছু উৎপত্তির পেছনে কোন না কোন কারণ থাকে। অর্থাৎ সব কিছুই কারণ সাপেক্ষ। ঠিক অনুরূপভাবে বেদনা উৎপন্ন হওয়ার পেছনেও কারণ রয়েছে। কি কারণ? “ফসসো পচ্চয়া বেদনা” অর্থাৎ স্পর্শের কারণেই বেদনা উৎপন্ন হয়। স্পর্শ ছয় প্রকার। যথাঃ চক্ষুর সাথে রূপালম্বনের সংস্পর্শ, শ্রোত্রের সাথে শব্দালম্বনের সংস্পর্শ, ঘ্রাণের সাথে গন্ধালম্বনের সংস্পর্শ, জিহ্বার সাথে রসালম্বনের সংস্পর্শ, কায়ের সাথে স্পর্শের সংস্পর্শ এবং মনের সাথে ধর্মের সংস্পর্শ।

কোন্ কোন্ স্থানে বেদনা উৎপন্ন হয়?

বেদনা উৎপন্ন হওয়ার ছয়টি স্থান আছে। যথাঃ চক্ষু প্রসাদে, শ্রোত্র প্রসাদে, ঘ্রাণ প্রসাদে, জিহ্বা প্রসাদে, কায় প্রসাদে ও মনে। উক্ত ছয়টি স্থানে অবিচ্ছিন্ন নদী স্রোতের ন্যায় মুহূর্তহীন ভাবে বেদনা উৎপন্ন হয়ে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

বেদনার স্বভাব ধর্ম কিরূপ?

বেদনার স্বভাব ধর্ম হচ্ছে জলবুদ্বুদ উৎপন্ন হওয়া মাত্রই ধ্বংস হওয়ার ন্যায় বেদনাও ছয়টি স্থানে উৎপন্ন হওয়া মাত্রই বিলয় বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেটা সুখ বেদনা হোক, দুঃখ বেদনা হোক অথবা উপেক্ষা বেদনাই হোক প্রত্যেক বেদনা এই স্বভাব ধর্মের - উৎপন্ন হওয়া মাত্রই বিলয় বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা কিভাবে নিরোধ হয়?

সাধক বা যোগী যখন পঞ্চাঙ্গ মার্গ (সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি, সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প) দ্বারা ছয়টি স্থানে উৎপন্ন বেদনাকে উদয়-বিলয় ও অনিত্যরূপে দর্শন করেন, তখন বেদনা নিরোধ হয়। অর্থাৎ তৃষ্ণাকে উৎপন্ন করার মত বেদনার যে

প্রত্যয় শক্তি ছিল তা বিনষ্ট বা নিরোধ হয়ে যায়। ফলে বেদনার প্রত্যয় শক্তির অভাবে তৃষ্ণা আর উৎপন্ন হতে পারেনা। এভাবে সাধক বা যোগী পঞ্চাঙ্গ মার্গ দ্বারা বেদনার উদয়-বিলয় ও অনিত্যতাকে দর্শনের ফলে বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ করে থাকেন।

উপরোক্ত পাঁচটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের ধারণা দেওয়ার পর হয়তোবা কিছুটা হলেও সাধকগণ বেদনানুপস্‌সনার বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছেন। এবার বেদনানুপস্‌সনার মূল বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

বেদনাকে দুঃখ সত্যরূপে জানুন :

বেদনা কি সত্য? দুঃখ সত্য। এই দুঃখ সত্যই হচ্ছে বিদর্শনের মূল বিষয়। দুঃখকে দুঃখরূপে জানতে না পারলে সমুদয় সত্য অবিদ্যা ও তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। আর এই সমুদয় সত্যই পুনঃপুনঃ দুঃখ সত্যকে উৎপন্ন করে। সে জন্য বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃখ সত্যকে যথাভূতভাবে জেনে নেওয়া। সমুদয় সত্য বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের বিষয় নয়। কারণ সমুদয় সত্য প্রহাণতব্য বিষয় বা ধর্ম। কিন্তু, বেদনা যে দুঃখ সত্য তা সাধকগণ কিভাবে জানেন? সাধক যখন সম্যক্ স্মৃতি অনুশীলনে রত থাকেন, তখন তিনি জানেন যে, ছয়টি স্থানের মধ্যে যে কোন একটি স্থানে স্পর্শের কারণে বেদনা উৎপন্ন হচ্ছে এবং তৎক্ষণেই বিলয় প্রাপ্ত হচ্ছে। উৎপন্ন বেদনা একমুহূর্তও স্থিতি থাকেনা - উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে বিলয় প্রাপ্ত হচ্ছে। সে জন্য বলা হয়েছে “উপ্লাদ বয় পটিপীলিনাখায়” অর্থাৎ এই উদয়-বিলয় ধর্মই সত্ত্ব জীবগণকে প্রতিনিয়ত প্রপীড়ন বা দুঃখ প্রদান করে। এ কারণে উদয় বিলয় ধর্মকেই ‘দুঃখ’ বলা হয়।

কিন্তু দেখা যায়, অনেক সাধকই আছেন যারা স্মৃতি অনুশীলন কালীন সময়ে পায়ে ব্যাথা, কোমরে ব্যাথা, মাথা ঝিনঝিন করে

ব্যাথা হওয়া এবং সর্বাত্মে উৎপন্ন ব্যাথাকেই দুঃখ সত্যরূপে জানেন। তারা এই ব্যাথাকে অনেক ধৈর্য্য-সহ্য করে ঘন্টা দু'য়েক বসে থাকার পর পরবর্তীতে দেখা গেল কোন ব্যাথা বেদনা আর নেই। দেহটা একেবারেই হালকা পাতলা হয়ে গেল - যেমনটি শূন্যমার্গে ভাসমান তুলার ন্যায় অনুভব হচ্ছে। এই অবস্থা সাধকের অত্যন্ত স্বস্তিকর ও আরাম দায়ক - যা ঘন্টার পর ঘন্টা ভাবনার আসনে বসে থাকলেও কোন অস্বস্তিকর বোধ হবে না। সাধক তখন মনে করেন যে, ব্যাথাকে আমি জয় করেছি, ব্যাথা আজ আমার হাতে পরাস্ত। এই ভেবে তিনি অনেক আনন্দিত ও উৎফুল্ল হন। কিন্তু দেখা যায়, পরবর্তীতে ধ্যানে বসলে একই অবস্থা। অর্থাৎ ব্যাথা আবার নতুনভাবে শুরু। এভাবে তিনি অনেক সময় ব্যাথার প্রতি বিরক্ত হয়ে ধ্যান আসন হতে উঠে পড়েন এবং ভাবনার প্রতি অবশেষে অনিহার সৃষ্টি হয়।

সে জন্য সাধকগণের জেনে রাখা ভাল যে, তিনি কোন্ দুঃখ নিয়ে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করবেন। দুঃখ তিন প্রকার। যথা- দুঃখ দুঃখং, সঙ্ঘরা দুঃখং এবং বিপরিনাম দুঃখং।

১. দুঃখ দুঃখং। অর্থাৎ- এই নাম-রূপ দুঃখ সত্য হওয়ার সত্ত্বেও ক্ষুধার কারণে, পিপাসার কারণে, শীত-উষ্ণতার কারণে অথবা একই স্থানে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকে, দাঁড়িয়ে থাকলে বা শুয়ে থাকলে দেখা যাবে কোমরে ব্যাথা, মাথায় ঝিনঝিন করা ও সর্বাত্মে ব্যাথা বেদনা উৎপন্ন হওয়াকেই - দুঃখ দুঃখং বা দুঃখ দুঃখতা বলে।

২. সঙ্ঘরা দুঃখং। অর্থাৎ- নাম-রূপ পঞ্চক্কদ্ধ সর্বদা উদয়-বিলয়ধর্মী। আর এই উদয় বিলয় জনিত যে প্রপীড়ন বা দুঃখ তাকেই সঙ্ঘরা দুঃখং বা সংস্কার দুঃখতা বলে।

৩. বিপরিনাম দুঃখং। অর্থাৎ- বৃদ্ধ হওয়া, রোগাশ্রয় হওয়া, দৈহিক অক্ষম হওয়া, চুল পাকা, দৃষ্টি শক্তি লোপ পাওয়া, কানে কম শোনা, লোলচর্মী হওয়া, দন্তপতন বা যে যে ভাবে ইচ্ছা করা হয়

সে সে ভাবে না হয়ে তার বিপরীত হওয়ার কারণে যে দুঃখ তাকেই বিপরিনাম দুঃখ বা বিপরীনাম দুঃখতা বলে।

দুঃখ মুক্তিকামী সাধকগণ, আপনারা যদি উপরোক্ত তিন প্রকার দুঃখের মধ্যে থেকে দুঃখ দুঃখতা ও বিপরীনাম দুঃখতা দিয়ে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করেন, তাহলে আপনাদের বিদর্শন মার্গ জ্ঞান উৎপন্ন হবে না এবং শাস্বত দৃষ্টি, উচ্ছেদ দৃষ্টি ও সংকায় দৃষ্টিকেও প্রহান বা ত্যাগ করতে পারবেন না। কেবলমাত্র আপনাদের ‘সংবেগময় জ্ঞান’ উৎপন্ন হবে, এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। সেজন্য, বিদর্শন ভাবনাতে উক্ত দুঃখদ্বয় মূল দুঃখ নয়।

‘সঙ্ঘরা দুঃখ বা সংস্কার দুঃখতাই’ হচ্ছে বিদর্শন ভাবনায় মূল দুঃখ। দৈহিক ব্যাথা বেদনা ঔষধ প্রত্যয় সেবনের দ্বারা সাময়িক উপশম করা যায়। কিন্তু, উদয়-বিলয় জনিত দুঃখকে ঔষধ প্রত্যয় কিংবা উন্নতমানের চিকিৎসা দ্বারাও উপশম করা অসম্ভব। কারণ, উদয়-বিলয় দুঃখ হচ্ছে পরমার্থ দুঃখ সত্য। এই পরমার্থ দুঃখ সত্যকে কোন প্রকারেও তার স্বভাব হতে আলাদা বা পরিবর্তন করিয়ে দেওয়া সম্ভবপর নয়। সেজন্য বিদর্শনের বিষয় বস্তু সর্বদা পরমার্থ হতে হয়। আর এই পরমার্থ দুঃখ সত্যকে জ্ঞাত বা দর্শনের দ্বারাই সম্যক্ দৃষ্টি বা বিদর্শন মার্গ জ্ঞানের উদয় হয়ে থাকে। সাধক যখন সম্যক্ স্মৃতির দ্বারা দুঃখ সত্য বেদনাকে উদয় ক্ষণে উদয়রূপে জানলে শাস্বত দৃষ্টিকে, বিলয় ক্ষণে বিলয়রূপে জানলে উচ্ছেদ দৃষ্টিকে এবং উৎপন্ন বিদর্শন মার্গ জ্ঞানের দ্বারা বেদনার অনিত্যতাকে দর্শনের ফলে সংকায় দৃষ্টিকে সমূলে প্রহাণ বা ত্যাগ করতে সক্ষম হন। এভাবে সাধক দুঃখ সত্য বেদনাকে উদয়-বিলয় ও অনিত্যরূপে দর্শনের ফলে দৃষ্টিকে সমূলে প্রহাণ পূর্বক মার্গ-ফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

বেদনার উদয় বিলয়কে জানুন :

সাধকগণ আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে, বেদনানুপস্‌সনার স্মৃতি অনুশীলন করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বেদনার উদয়-বিলয়কে জেনে নেওয়া। কারণ বেদনার উদয়-বিলয়কে জানতে না পারলে অনিত্যতা জ্ঞান উৎপন্ন হবেনা। আর যদি অনিত্যতা জ্ঞান পরিপক্ব না হয়, তাহলে মার্গ জ্ঞানও উৎপন্ন হবেনা। তাই, বেদনার উদয়-বিলয়কে দর্শন ব্যতীত সেটা বেদনানুপস্‌সনা স্মৃতি অনুশীলন যথাভূতভাবে নয় বলে জানবেন। অনেক সাধকই আছেন যারা সুখ বেদনা উৎপন্ন হলে এতে তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা সুখ বেদনায় মগ্ন হয়ে থাকেন। অর্থাৎ তখন তাঁরা বেদনাকে স্মৃতি অনুশীলন করতে ভুলে যান এবং সুখ বেদনাকে গভীরভাবে অনুভব করেন। ফলে তাঁরা বেদনার উদয়-বিলয় ও অনিত্যতাকে দর্শন হতে বঞ্চিত হন এবং বিদর্শন ভাবনা হতেও চ্যুত হয়ে থাকেন। কাজেই সাধকগণের মনে রাখতে হবে যে, স্মৃতি অনুশীলন কালে সুখ বেদনা হোক দুঃখ বেদনা হোক অথবা উপেক্ষা বেদনাই হোক প্রত্যেক বেদনার উদয়-বিলয়কে জানতে চেষ্টা করুন। বেদনার উদয়-বিলয় ও অনিত্যতাকে জানতে হলে সাধকের পাঁচটি মার্গাঙ্গের দরকার হয়ে পড়ে। সে গুলো হলঃ সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি, সম্যক্ দৃষ্টি এবং সম্যক্ সংকল্প। এই পাঁচটি অঙ্গকে এক্ষেত্রে পঞ্চাঙ্গ মার্গ বলা হয়। উক্ত পাঁচ প্রকার অঙ্গের মধ্যে প্রথম তিন প্রকার অঙ্গ হচ্ছে অনুশীলনধর্মী অঙ্গ এবং শেষের দুই অঙ্গ হচ্ছে উৎপন্নধর্মী অঙ্গ। সাধক যখন বিদর্শন ভাবনায় রত থাকেন বা সম্যক্ স্মৃতি অনুশীলনে রত থাকেন, তখন সম্যক্ ব্যায়াম প্রচেষ্টা বলের দ্বারা স্মৃতিকে উপকার করে থাকে, যাতে স্মৃতি দুর্বল না হয়ে সবলতার সাথে বেদনার উদয়-বিলয়কে জানতে সক্ষম হয়। আর সম্যক্ সমাধিও কম্পনহীন স্বচ্ছ জলের নিচে মৎস্যাদি দর্শনের ন্যায় চঞ্চলতাকে প্রহাণ করে, যাতে সম্যক্ স্মৃতি বেদনাকে যথাভূতভাবে জানতে পারে। সম্যক্ ব্যায়াম ও সম্যক্ সমাধির বলে বলবান

সম্যক্ স্মৃতি ছয়টি স্থানে উৎপন্ন বেদনাকে উৎপন্ন ক্ষণে উদয়রূপে এবং বিলয়ক্ষণে বিলয়রূপে পুনঃপুনঃ যথাভূতভাবে জানতে থাকেন। এভাবে সম্যক্ স্মৃতি বেদনার উদয়-বিলয়কে পুনঃ পুনঃ জানাতে সম্যক্ ব্যায়াম ও সম্যক্ সমাধি আরো অধিক পরিমাণে বলবান হতে থাকে। সাধক যখন সম্যক্ স্মৃতির দ্বারা বেদনাকে উদয়-বিলয়রূপে জানেন, সে বেদনা বিলয় হওয়ার সাথে সাথেই সম্যক্ দৃষ্টি বা লৌকিক বিদর্শন মার্গ জ্ঞান হয়। এই উৎপন্ন লৌকিক বিদর্শন মার্গ জ্ঞানের দ্বারাই সাধক বেদনার অনিত্যতা বা শূন্যতা দর্শন করে থাকেন।

দুঃখ সত্য বেদনার আহ্বান :

দুঃখ মুক্তিকামী বেদনানুপস্সনা অনুশীলন কারী সাধকগণ, আপনারা কি কোন দিন বেদনার ডাক শুনেছেন? হয়তো উত্তর হবে 'না'। যদি তাই হয়, বেদনার ডাক কিরকম তা শুনবার জন্য অনুশীলনে গভীরভাবে মনযোগী হোন। তখন দেখবেন যে, আপনি কোন না কোন সময় নিশ্চয় বেদনার ডাক শুনতে পাচ্ছেন। হয়তো অনেক সাধকই আছেন, যারা এই নিয়ে অনেক বিতর্কিত হবেন এভাবে যে, বেদনার আবার কিসের ডাক? যা কোন দিনও শুনা যায় নাই? সাধকগণের এরূপ বিতর্ক বিতারণ করার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন ধরুন, আপনার পেটে ভুজাহার শেষ হয়ে গিয়েছে, তা আপনি কিভাবে জানলেন? পেটের ভেতরে মুখ আছে নাকি যা আপনাকে বলে দিবে যে, ভুজাহার শেষ হয়ে গিয়েছে তুমি পুনঃরায় পেটে আহার ভর্তি কর। হ্যাঁ যদিও পেটের ভেতরে কোন মুখ নাই যা আমাকে তা বলে দিবে। না বলার সত্ত্বেও আমি কিষ্ট তা মনের প্রকৃতি দ্বারা জানতে পারি।

কিষ্ট বেদনার ক্ষেত্রে ঐ থেকে অনেক ভিন্ন। কারণ, বেদনা মানসিক অর্থাৎ খুবই সূক্ষ্ম প্রকৃতির। তার মানে, এক মনের ডাক অন্য মনকে শুনতে হবে। সেই জন্য ইহা অতীব গভীর ও সূক্ষ্মতর।

তাই এই বেদনার ডাক কেউ সহজে শুনতে পাননা। কেবলমাত্র যারা বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করেন, তারাই শুনতে পান। সাধকগণ, তাহলে চলুন বেদনার ডাক শুনতে চেষ্টা করি। ছয়টি স্থানের মধ্যে যে কোন একটি স্থানে যখন বেদনা উৎপন্ন হয়, তখন উৎপন্ন বেদনা দু'টির কথার দ্বারা সাধক বা যোগীকে (সম্যক স্মৃতিকে) আহ্বান বা ডাকে। সে দু'টি ডাক বা আহ্বান হচ্ছে 'এহি' এবং 'পস্‌স'। 'এহি' অর্থ হল "হে যোগী! আমি উৎপন্ন হয়েছি, এবার তুমি এস"। আর 'পস্‌স' অর্থ দেখ যোগী, আমি উৎপন্ন হলে বিলয় না হয়ে থাকতে পারি না, উৎপন্ন হওয়া মাত্রই বিলয় হতে হয়। উদয়-বিলয় ছাড়া আমার কিছুই নাই। তুমি এই উদয়-বিলয়কে যথাভূতভাবে দেখে নাও। এই বলে বেদনা তৎক্ষণাৎ বিলয় বা বিনাশ হয়ে যায়। সাধকগণ, আপনারা উক্ত বেদনার দু'টি ডাক বা আহ্বান শুনতে পারেন, যদি আপনাদের সে সময়ে পঞ্চাঙ্গ মার্গ অটুট থাকে।

উদয়-বিলয়ের পরেই মার্গ জ্ঞান :

বেদনাপস্‌সনা অনুশীলনকারী সাধক স্মৃতি ভাবনা অনুশীলনে যখন দক্ষ ও অভিজ্ঞ হন, তখন তিনি কেবলমাত্র বেদনার উদয়-বিলয়কে স্পষ্টভাবে জেনে জেনে স্মৃতি ভাবনায় রত থাকেন। তখন সাধকের সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প খুবই তীক্ষ্ণ হতে তীক্ষ্ণতর হতে থাকে। সাধক যখন উৎপন্ন বেদনাকে সম্যক স্মৃতির দ্বারা উদয়ের ক্ষণে উদয়রূপে এবং বিলয়ের ক্ষণে বিলয়রূপে জানার সাথে সাথে বেদনা নিরোধ হয়। তখন আর বেদনা পচায় তৎহা অর্থাৎ বেদনার কারণে তৃষ্ণা উৎপন্ন না হয়ে, বেদনার কারণে সম্যক দৃষ্টি বা লৌকিক বিদর্শন মার্গ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই মার্গ জ্ঞানের দ্বারাই বেদনার অনিত্যতাকে বা শূন্যতাকে দর্শন করা হয়। তখন সাধক লৌকিক বিদর্শন মার্গ জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, উৎপন্ন বেদনা

বিলয়ধর্মী বা বিনাশধর্মী ছাড়া কিছুই নয়। আর এই বিনাশধর্মী বেদনার নিত্যতা বলতে কিছুই নাই। কেবলমাত্র অনিত্যতাই বিরাজমান। এভাবে সাধক সম্যক স্মৃতির অনুশীলনের দ্বারা উৎপন্ন বেদনাকে উদয়-বিলয়রূপে জানার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ মার্গ জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে বেদনার অনিত্যতাকে দর্শন করতে করতে অবস্থান করেন। বেদনার অনিত্যতা দর্শনের ফলে সাধকের আমি ও আমার ধারণা বা সৎকায়দৃষ্টি ক্রমপর্যায়ে ক্ষীণ হতে থাকে। কিন্তু, সৎকায়দৃষ্টি লোকুত্তর মার্গ উৎপন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। সাধক যতই বেদনার অনিত্যতা দর্শন করতে থাকেন, ততই বেশী তাঁর বেদনার প্রতি বিরাগতা জন্মে। শুধুমাত্র বেদনার প্রতি নয়, সমস্ত সংস্কারের প্রতি তাঁর এই বিরাগতা উৎপন্ন হয়। এভাবে সাধক ক্রমগতিতে বেদনার অনিত্যতাকে দর্শন করার ফলে, একপর্যায়ে তাঁর অনিত্যতা জ্ঞান পরিপক্ব হতে থাকে। অর্থাৎ লৌকিক বিদর্শন মার্গ জ্ঞান পরিপক্ব হতে শুরু করে। তখন সাধক সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা বা উপেক্ষা বেদনা সহ প্রত্যেক বেদনার প্রতি তাঁর কোন অনুরক্ততা বা আসিদ্ধ থাকেনা। এভাবে সাধক স্মৃতি ভাবনা অনুশীলন করতে করতে লৌকিক বিদর্শন মার্গ জ্ঞান পরিপক্ব হওয়ার সাথে সাথেই লোকুত্তর মার্গ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই লোকুত্তর মার্গ জ্ঞান উৎপন্ন ক্ষণেই সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা এবং শীলব্রত পরামর্শকে সমূলে গ্রহণ বা ত্যাগ পূর্বক সাধক স্রোতাপত্তি মার্গ ফলে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন।

দশ প্রকার বিদর্শন জ্ঞান

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের সময় সাধকের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই বিদর্শন জ্ঞান। বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন ব্যতীত এই জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। তাই কেবলমাত্র যাঁরা বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করেন তাঁদের জন্যই এই জ্ঞান। বলা যায়, এই বিদর্শন জ্ঞানই দুঃখ মুক্তির সূচনা করে বা দুঃখ মুক্তির পথে অগ্রসর করাই। বিদর্শন জ্ঞান দশ প্রকার। যথাঃ ১. সংমর্শন জ্ঞান ২. উদয়-বিলয় জ্ঞান ৩. ভঙ্গ জ্ঞান ৪. ভয় জ্ঞান ৫. আদীনব জ্ঞান ৬. নির্বেদ জ্ঞান ৭. মুমুক্ষা জ্ঞান ৮. প্রতिसংখ্যা জ্ঞান ৯. সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান এবং ১০. অনুলোম জ্ঞান। এই দশ প্রকার বিদর্শন জ্ঞান সমূহ হচ্ছে অনুশীলন জাত লৌকিক বিদর্শন জ্ঞান। অনুশীলন কালে এই জ্ঞান সমূহ অগণিতবার, অসংখ্যবার উৎপন্ন হতে পারে - যার কোন হিসেব করা যায় না। অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত উক্ত দশ প্রকার বিদর্শন জ্ঞান সমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ব না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপন্ন হবে। কিন্তু, লোকুত্তর মার্গ জ্ঞান সমূহ কেবলমাত্র একবার করে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

দশ প্রকার বিদর্শন জ্ঞান সমূহকে নিম্নে সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করা হলঃ

১. সংমর্শন জ্ঞান :

‘সংমর্শন’ শব্দের অর্থ হচ্ছে যথাভূত সম্যক্ চিন্তা। স্কন্ধ সমূহের প্রতি যথাভূত সম্যক্ চিন্তা জাত জ্ঞানই - ‘সংমর্শন জ্ঞান’। সংমর্শন জ্ঞান বিদর্শন অনুশীলন জাত জ্ঞান নহে। বলা যায়, সংমর্শন জ্ঞান ইহা বিদর্শন সাধকের লৌকিক ও লোকুত্তর মার্গ-জ্ঞান লাভের প্রাথমিক সূচনা মূলক জ্ঞান। হতে পারে ইহা, সাধকের শ্রুত জাত ও চিন্তা জাত পঞ্চস্কন্ধের প্রতি সংবেগময়তা ও বিপরীনাম-ধর্মীতা জ্ঞান। সাধক যখন শ্রুতময় ও চিন্তাময় জ্ঞানের দ্বারা স্কন্ধের প্রতি

গভীর মনোযোগী হন, তখন চিন্তা করেন যে, এই রূপ-দেহ দিন দিন পরিবর্তনতার মধ্য দিয়ে জরাগ্রস্থ বা বয়োবৃদ্ধ হচ্ছে, ব্যাধিগ্রস্থ হচ্ছে, ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি) সমূহের শক্তি লোপ প্রাপ্ত হচ্ছে এবং এভাবে ক্রম পরিবর্তনতার স্রোতের মধ্য দিয়ে একদিন ভব-লীলা বা মৃত্যুবরণ করতে হবে। সাধক তখন নাম-রূপের পরিবর্তনতা বা অনিত্যতা ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করতে পারেন না। সাধক আরো চিন্তা করেন যে, যা অনিত্য তা দুঃখ আর যা দুঃখ তা অনাত্ম বা আমি, আমার হতে পারেনা - সুতরাং তা অনাত্ম। এভাবেই সাধক শ্রুতময় ও চিন্তাময় জ্ঞানের দ্বারা স্ফের প্রতি গভীরভাবে পুনঃপুনঃ যথাভূত সম্যক্ চিন্তা করে স্ফের প্রতি যে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মময়তার প্রাথমিক জ্ঞান জন্মে তাহাই “সংমর্শন জ্ঞান”।

২. উদয়-বিলয় জ্ঞান :

দুঃখ মুক্তি তথা নির্বাণ অধিগত হওয়ার উদ্দেশ্যে যদি কোন সাধক চারি অনুপস্সনার (কাযানুপস্সনা, বেদনানুপস্সনা, চিত্তানুপস্সনা এবং ধম্মানুপস্সনা) মধ্যে যে কোন একটি অনুপস্সনাকে (স্ফের অনুদর্শনকে) নিয়ে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করেন, তখন সাধক অনুপস্সনা স্ফের প্রকৃত স্বভাব-ধর্ম উদয়-বিলয়কে সম্যক্ স্মৃতির দ্বারা যথাভূত ভাবে পুনঃপুনঃ জানেন। এই অনুপস্সনা স্ফের প্রকৃত স্বভাব-ধর্মকে সাধক সম্যক্ স্মৃতির দ্বারা পুনঃপুনঃ জানার মাধ্যমে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই - “উদয়-বিলয় জ্ঞান”।

৩. ভঙ্গ জ্ঞান :

সাধক সম্যক্ স্মৃতির দ্বারা স্ফের উদয়-বিলয়কে দর্শন বা পুনঃপুনঃ জানার মাধ্যমে পরবর্তীতে তিনি দেখতে পান যে, স্ফ সমূহ অবিশ্রান্ত গতিতে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে। স্থায়ী বলতে সাধক কিছুই দেখতে পান না।

অনব্রত কেবল স্কন্ধ সমূহের ভগ্ন বা ভঙ্গতাকেই দর্শন করতে থাকেন। সাধক বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের সময় স্কন্ধ সমূহের যে ভগ্ন বা ভঙ্গতা দর্শন করেন তাহাই “ভঙ্গ জ্ঞান”।

৪. ভয় জ্ঞান :

সাধক অনুপস্সনা স্কন্ধের ভঙ্গুরতা দর্শন করতে করতে তাঁর এক পর্যায়ে স্কন্ধের প্রতি ভীষণ ভীতির সঞ্চার হয়। কারণ সাধক পূর্বে মনে করতেন যে, এই নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধ নিত্য, ধ্রুব ও অক্ষয়তার দৃষ্টি পোষণ করতেন। কিন্তু এখন বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন যে, নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধ ক্ষণ ভঙ্গুরতা ছাড়া কিছুই নয়। সাধক যখন নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধে কোনরূপ নিত্যতা বা স্থায়ীতার আশ্রয় খুঁজে পাননা তখন স্কন্ধের প্রতি সাধকের যে ভয়-ভীতি জন্মে তাহাই “ভয় জ্ঞান”।

৫. আদীনব জ্ঞান :

সাধক স্কন্ধের প্রতি অত্যাধিক ভয়াত হয়ে তিনি আরো গভীরভাবে ভাবনা অনুশীলনে রত হন। ভাবনা অনুশীলন করতে করতে তিনি আরো উপলব্ধি করেন যে, সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের উদয়-বিলয় ও অনিত্যতা প্রাপ্ত হওয়াই এদের ধর্মতা। উদয়-বিলয় ও অনিত্যতা ব্যতীত সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের কিছুই নাই। কাজেই, উদয়-বিলয় ও অনিত্যতাই সংস্কার এবং স্কন্ধ সমূহের আদীনব বা দোষ। এভাবে সাধক সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের প্রতি আদীনব বা দোষ সমূহকে পুনঃপুনঃ দর্শনে যে জ্ঞান জন্মে তাহাই “আদীনব জ্ঞান”।

৬. নির্বেদ জ্ঞান :

সাধক সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহকে আদীনবরূপে বা দোষযুক্তরূপে দর্শন করতে করতে তখন তাঁর সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধের প্রতি যে আমি, আমার বা সংকায় দৃষ্টির অনুরক্ততা বা আসক্ততা ছিল,

ক্রমগতিতে ক্ষীণ হতে থাকে। এক পর্যায়ে সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের প্রতি উদাসীনতা ও অনিহার প্রবণতা বেড়ে যায়। যেমনঃ- দোষ যুক্ত বা বাসি-দুর্গন্ধপূর্ণ ভোজনের প্রতি মানুষের যে রূপ ভোজনে অনিহা, উদাসীনতা ও অনুরক্তহীনতার প্রবণতা খুববেশী প্রকটিত হয়, ঠিক অনুরূপভাবে সাধকও সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের আদীনব বা দোষ দর্শন পূর্বক এতে আমি, আমার বা সংকায় দৃষ্টির প্রতিও সাধক প্রচণ্ড রকমের উদাসীনতা, অনুরক্তহীনতা ও নির্লিপ্ততাপন্ন হন। এই ভাবেই সাধক সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধের প্রতি পুনঃপুনঃ আদীনব বা দোষ দর্শনের ফলে যে উদাসীনতা বা অনুরক্তহীনতার জ্ঞান জন্মে তাহাই “নির্বৈদ জ্ঞান”।

৭. মুমুক্ষা জ্ঞান :

সাধক যখন সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধের প্রতি নির্বৈদাপন্ন হন, তখন তিনি এর থেকে মুক্তির ইচ্ছুক হয়ে থাকেন। সাধকের মন তখন রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পঞ্চকাম গুণ সমূহতে কোন প্রকার রমিত হন না। সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহ হতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা তখন তাঁর খুবই প্রকটিত হতে থাকে। যেমনঃ জালাবদ্ধ মৎস্য বা সর্পের মুখাঙ্গ মণ্ডক (ব্যাঙ) সে বিপদাপন্ন স্থান হতে মুক্ত হওয়ার জন্য যে রূপ ব্যাকুল হয়, ঠিক তদ্রূপভাবে সাধকও সংস্কার ও স্কন্ধের উদয়-বিলয় ও অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্মাময়তার বিপন্ন বা উপদ্রব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে থাকেন। এভাবে সাধক সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের অদীনব ও উপদ্রব হতে মুক্ত হওয়ার যে প্রবলাকারের ইচ্ছা তাহাই “মুমুক্ষা জ্ঞান”।

৮. প্রতिसংখ্যা জ্ঞান :

সাধক সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধের উদয়-বিলয় ও অনিত্যতার দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা অতীব বলবত্তার ফলে তখন তিনি এর থেকে মুক্তির উপায় বা পথ অন্বেষণ করেন। মুক্তির উপায় অন্বেষণ করতে গিয়ে

সাধক মার্গ অনুশীলনের দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহ মাত্রই উদয়-বিলয় ও অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মময়ধর্মী। ইহা ভিন্ন এখানে আর কোন কিছু নাই। কিন্তু, এই সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের উদয়-বিলয় ও অনিত্যতা মার্গ দ্বারা অদর্শনে ক্ষণ মুহূর্ত বর্তমান কালে সমুদয় সত্য তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্ম-ভবাদি উৎপন্ন হয়। আর যদি মার্গ দ্বারা সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহকে উদয়-বিলয় ও অনিত্যতা রূপে দর্শন করা যায়, তাহলে সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের নিরোধ হয়; যার ফলে সমুদয় সত্য তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্ম-ভবাদের নিরোধ হয়ে থাকে। এই ভাবে সাধক মার্গ অনুশীলনের দ্বারা সমুদয় সত্য তৃষ্ণাদির দিকে প্রবর্তিত না হয়ে, সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের নিরোধের দিকে প্রবর্তিত হন। কারণ, সাধক উপলব্ধি করেন যে, এই সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহই দুঃখ সত্য আর সমুদয় সত্য তৃষ্ণাদিই পুনঃপুনঃ এই দুঃখ সত্য স্কন্ধ সমূহকে উৎপন্ন করে থাকে। তাই সাধক সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের উদয়-বিলয় ও অনিত্যতাকে মার্গ দ্বারা দর্শনেই দুঃখ মুক্তির উপায় বা পথ হিসেবে অবধারণ বা বেচে নেন। এভাবেই সাধক দুঃখ মুক্তির মার্গ বা উপায় উদ্ভাবনের যে জ্ঞান তাহাকেই “প্রতিসংখ্যা জ্ঞান” বলে।

৯. সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান :

মুক্তির উপায় উদ্ভাবনের পর সাধক সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অকম্পিত ও নিরপেক্ষতা ভাব ধারণ করেন। অর্থাৎ সুখে বা দুঃখে কিংবা কোন অবস্থাতে ~~তখন~~ তিনি বিচলিত বা কম্পিত না হয়ে অবস্থান করেন। কারণ সাধক মার্গ জ্ঞানের দ্বারা জানেন যে, সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহ মাত্রই উদয়-বিলয় ও অনাত্মময় - তা আমি নই, আমার নহে, সত্ত্ব নয়, জীব নয়, স্ত্রী নয়, পুরুষ নয় ইহা সংস্কার ও স্কন্ধের এক অবিচ্ছিন্ন নদী স্রোতের ন্যায় বা বীজ ও বৃক্ষের ধর্মতার ন্যায় প্রকৃতির স্বভাব ধর্মতা মাত্র। সাধক তখন সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধ ধর্মে নিরপেক্ষ ও অবিচলিত হয়ে কেবলমাত্র সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের উদয়-বিলয় ও অনিত্যতা দর্শন

করে থাকেন। এভাবে সাধক সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধ ধর্মের প্রতি যৈ, স্থিরতা, অবিচলতা বা নিরপেক্ষতার জ্ঞান তাহাকেই “সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান” বলে।

১০. অনুলোম জ্ঞান :

সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞানের পর সাধক আরো মার্গ ভাবনা অনুশীলনে সুদৃঢ়বদ্ধ হন। এমতাবস্থায় সাধক সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে নিরপেক্ষ হয়ে মার্গ ভাবনা অনুশীলনে নিবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে থাকেন। তারপর সাধক সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের প্রতি আমি, আমার এরূপ অনুরক্ততা বা আসক্ত আছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পুনঃরায় উদয়-বিলয় জ্ঞান হতে সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত তিনি এই আটটি জ্ঞানকে অনুলোমাকারে প্রত্যবেক্ষণ করেন। তখন সাধক জানেন যে, সংস্কার ও স্কন্ধের প্রতি তাঁর একবিন্দু মাত্রও অনুরক্ততা বা আসক্তি নেই - যেমনটি দুর্গন্ধযুক্ত মলের প্রতি মানুষের থাকেনা।

সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধের প্রতি যে বিরাগতা ও আসক্তিহীনতা জ্ঞান জন্মে তখন ইহাকে লৌকিক বিদর্শন মার্গ জ্ঞানের পরিপক্বতা বলা হয়। আর এই জ্ঞানই সাধকের লোকুত্তর মার্গ জ্ঞান লাভের উপযোগী বা অনুকূলতা হয়ে থাকে। সুতরাং, এই লোকুত্তর মার্গ জ্ঞান লাভের অনুকূল জ্ঞানকেই “অনুলোম জ্ঞান” বলা হয়।

নির্বাণ

সার কল্প^৪, মণ্ড কল্প^৫, বর কল্প^৬, সার মণ্ড কল্প^৭ ও ভদ্র কল্প^৮। এই পঞ্চ কল্পই হচ্ছে বুদ্ধগণের উৎপত্তি কল্প বা সময়। অন্যথায় বুদ্ধ-শূণ্য কল্প বলা হয়। বুদ্ধ শূণ্য কল্পে নির্বাণ সাক্ষাত ও বুদ্ধগণের মুখনিঃসৃত বাণী এই নির্বাণ শব্দটি শ্রবণের সুযোগ কখনো সম্ভব হয় না। পূর্বোক্ত ঐ পঞ্চ কল্পের মধ্যে যে কোন কল্পে যখন দূর্লভ বুদ্ধগণ উৎপন্ন হন, তখনই অসংস্কৃত নির্বাণ সাক্ষাতের সুযোগ লাভ ঘটে। বোধিসত্ত্বগণ মহাবোধি দ্রুম তলে যখন বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তখনই অসংস্কৃত নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন। এবং আরো সর্বজ্ঞাতা জ্ঞানে দর্শন করেন যে, “অযং অস্তিম জাতি, নখি দানি পুনোভবিক” অর্থাৎ ইহাই আমার অস্তিম জন্ম (পচ্ছিম ভবো), আর আমার অনাগতে এই দুঃখময় সংসারে পঞ্চস্কন্ধ নামক নাম-রূপকে ধারণ তথা পুনঃজন্ম হবেনা। আর বুদ্ধের শ্রাবকগণও বুদ্ধের নির্দেশিত মার্গ (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ) অনুযায়ী ভাবনা অনুশীলন করে যখন স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহত্ত্ব মার্গ ও ফল লাভ করেন, তখন তাঁহারা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানে নির্বাণ উপলব্ধি করেন। নির্বাণ এক এমন পরমার্থ বিষয় যা কেবলমাত্র মার্গ-ফল লাভ ক্ষণে প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। দু’টি শব্দের অর্থ সমন্বয়ে গঠিত এই ‘নির্বাণ’ নামক শব্দটি। যেমনঃ ‘নি’ + ‘বান’ = নিব্বাণ।

‘নি’ অর্থে অভাবাত্মক, অবিদ্যমান ও নেতিবাচক। “বান” – অর্থে ক্রেশের (অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদানাদি) বন্ধন বা জটা। একার্থে

৪ . যে কল্পে এক জন বুদ্ধ উৎপন্ন হয় সে কল্পকেই সার কল্প বলে।

৫ . যে কল্পে দুই জন বুদ্ধ উৎপন্ন হয় সে কল্পকেই মণ্ড কল্প বলে।

৬ . যে কল্পে তিন জন বুদ্ধ উপন্ন হয় সে কল্পকেই বর কল্প বলে।

৭ . যে কল্পে চার জন বুদ্ধ উৎপন্ন হয় সে কল্পকেই সার মণ্ড কল্প বলে।

৮ . যে কল্পে পাঁচ জন বুদ্ধ উৎপন্ন হয় সে কল্পকেই ভদ্র কল্প বলে।

বলা যায়— ক্লেশের বন্ধন অভাব, অবিদ্যমান ও নেতিবাচকতাই “নির্বাণ”। উপরন্তু, ক্লেশাগ্নি নির্বাণিত হওয়াই “নির্বাণ”। প্রদীপ কিংবা আগুন জ্বলতে জ্বলতে নিভে যাওয়ার সদৃশ। প্রতীত্য-সমুৎপন্ন (অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ থেকে উৎপন্ন) নাম-রূপ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) তৃষ্ণার আকর্ষণে মিলিত হয়ে যে এক জীবন প্রবাহ প্রবাহিত হয়ে চলছে, এই প্রবাহের পরিসমাপ্ততার নামই “নির্বাণ”। তৈল প্রবাহ বন্ধ হলে যেমন প্রদীপের আগুন নিভে যায়, ঠিক তেমনি নানা ধরনের আসব (কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টাসব ও অবিদ্যাসব) ক্ষীণ হলে এই প্রতিত্যসমুৎপাদের (সমুদয় সত্য ও দুঃখ সত্য) নাম-রূপের জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ সেখানে অবসান ঘটে। এখানে “নির্বাণ” সম্বন্ধনীয় একটি উপমা দেওয়া যায়; যেমনঃ মনে করুন, এক জনৈক ব্যক্তি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটপট করতে লাগলেন, তখন কোন এক সহৃদয়বান ব্যক্তি তাহার প্রতি করুণা পরবশ হয়ে সে রোগ নিরাময়ের ঔষধ প্রদান করলেন এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রদত্ত ঔষধ সেবন করার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ তাহার রোগের অসহ্য যন্ত্রণার উপশম হল। সে অসহ্য রোগ হতে মুক্ত হয়ে যে একটা রোগ বিমুক্তির উপশম বা অসহ্য রোগ হতে মুক্ত হয়ে যে একটা প্রীতি বোধ অথবা স্বস্তিমনতা এই অনুভূতিটি তিনি কোন ভাষায় প্রকাশ করবেন বা অন্যকে তা যথায়তভাবে বুঝাবেন এটা কখনো সম্ভব নয়। কেবলমাত্র তিনিই যথায়তভাবে রোগ মুক্ততার উপশম জনিত প্রীতি বা স্বস্তিমনতা উপলব্ধি করতে পারবেন, তা অন্য কেউ বুঝা অসম্ভব। এখানে উদাহরণে বলা যায়; অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদানাদি ক্লেশ সমূহ অসহ্য ও ভীষ্ম যন্ত্রণা দায়ক “রোগোৎপত্তির কারণ” সদৃশ। অসহ্য যন্ত্রণা দায়ক নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের দুঃখতা হচ্ছে “রোগ” সদৃশ। অসহ্য রোগের উপশম সদৃশঃ মহা অসংস্কৃত ধাতু নিরোধ সত্য “নির্বাণ” এবং অসহ্য রোগের উপশমের উপায় ঔষধ সদৃশঃ দুঃখ নিরোধের উপায় অষ্টাঙ্গিক মার্গ সত্য। যাহারা তীক্ষ্ণ ধী-সম্পন্ন

তাহারা অতি সহজে নির্বাণ সম্পর্কে বুঝতে পারবেন উক্ত উদাহরণের দ্বারা। শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, নির্বাণ পারমার্থিক ভাবে বিদ্যমান, যার ফলে চর্ম চক্ষুর দ্বারা দৃশ্যনীয় বস্তু দর্শনের ন্যায় বুদ্ধ তথা আর্য্য শ্রাবকগণ ইহাকে মার্গ-ফল ও প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে থাকেন। তাই নির্বাণ ‘সচ্ছিকাতক’ অর্থাৎ সাক্ষাৎ করণীয় বা নির্বাণ নিজে নিজেই অধিগম্যনীয় ধর্ম।

এর বিদ্যমানতা হেতু ইহা মার্গ চিত্ত ও ফল চিত্তের আলম্বন হয়। সেই কারণে তথাগত বুদ্ধ অভিধর্মের মধ্যে বলেছেন ‘নির্বাণ’ আলম্বন ব্যতীত মার্গ ও ফল জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কারণ, যেহেতু মার্গ ও ফল লোকুত্তর বিষয়। আর নির্বাণ ও লোকুত্তর বিষয় বা ধর্ম। সেহেতু এক লোকুত্তর ধর্ম অন্য লোকুত্তর ধর্মের আলম্বন হয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকে - লৌকিক আলম্বনকে নিয়ে নয়।

আয়ুজ্ঞান বাহিয়ার নির্বাণ প্রাপ্তির উপলক্ষে বুদ্ধের উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য।

“যথ আপো চ পঠবী বাযো তেজো ন গাধতি,

ন তথ সুক্কা জোতন্তি আদিচো নপ্পকাসতি।

ন তথ ভাতি তমো তথ ন বিজ্জতি,

যদা চ অন্তনা বেদী মুনি মোনেন ব্রাহ্মণো।

অথা রূপা অরূপা চ সুখ দুক্খা পমুচ্চতীতি”। (উদান)

অর্থাৎ- নির্বাণে পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ুর অবস্থিতি বা বিদ্যমানতা নাই। নির্বাণ বস্তু দ্বারা রচিত নহে; সেখানে গ্রহ-নক্ষত্রের আলোক পাত করেনা বা চন্দ্র-সূর্যের কিরণও দীপ্ত হয় না। অথচ সেখানে অন্ধকারও নেই। এতাদৃশ নির্বাণকে যখন নিষ্কলুষ মুনি স্বীয় আধ্যাত্মিক সিদ্ধিও প্রভাবে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি রূপ-অরূপ, সুখ ও দুঃখাধীন ভব-বন্ধন হতে মুক্ত হন। এই ভব বন্ধন থেকে মুক্তি বা নির্বানে যে পরম শান্তিময়তা তা বুদ্ধ নিজেই প্রকাশ করেছেন “নিব্বাণং পরমং সুখং” অর্থাৎ নির্বাণ পরম সুখ।

বলা বাহুল্য, এখানে সুখের অর্থ স্থূল সুখ নহে (পঞ্চ কামগুণ জনিত সুখ নহে)। ইহা অনির্বচনীয় ও বিমুক্তিময় অনাবিল প্রীতি ও শান্তি সুখ। হেতু প্রত্যয় বিপ্রযুক্ত, অনাসক্ত ও অনাবরণ জ্ঞানের সুখানুভূতি। নির্বাণ স্বভাবানুসারে একবিধ। কারণ, নির্বাণের স্বভাব হচ্ছে “তেসং উপসমো সুখো” অর্থাৎ নির্বাণ সুখ হচ্ছে সর্ব সংস্কার ও স্কন্ধ সমূহের উপশম জনিত সুখ। আর কারণ পর্যায় ভেদে নির্বাণ দ্বি-বিধ। যথা—

১. স-উপাদিশেষ নির্বাণ - চারি আসব^৯, চারি ওঘ^{১০}, চারি যোগ^{১১}, চারি গ্রহি^{১২}, চারি উপাদান^{১৩}, ছয় নিবরণ^{১৪}, সপ্ত অনুশয় ক্লেশ^{১৫}, দশ সংযোজন^{১৬} ও দশ প্রকার ক্লেশ^{১৭} সমূহকে গ্রহণ করে বা ছেদন পূর্বক অনাগতে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ নিরোধের মাধ্যমে এই জীবনে নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের বিদ্যমানতায় যে অসংস্কৃত নির্বাণ উপলব্ধি বা অধিগত করা হয় তাহাকেই “স-উপাদিশেষ নির্বাণ” বলে। যেমনঃ সিদ্ধার্থ গৌতম গয়ার বোধিদ্রুম তলে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় সমস্ত ক্লেশকে ছেদন পূর্বক বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করেন। এভাবে বুদ্ধত্ব লাভ হতে অন্তিম মহা পরিনির্বাণ লাভের পূর্ব মুহূর্ত

৯. কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টাসব ও অবিদ্যাসব।

১০. কামওঘ, ভবওঘ, দৃষ্টিওঘ ও অবিদ্যাওঘ।

১১. কামযোগ, ভবযোগ, দৃষ্টিযোগ ও অবিদ্যাযোগ।

১২. অভিধ্যা কায় গ্রহি, ব্যাপাদ কায় গ্রহি, শীলব্রত কায় গ্রহি ও সত্যভিনিবেশ কায় গ্রহি।

১৩. কামোপাদান, দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান ও আত্মবাদোপাদান।

১৪. কামহন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা ও অবিদ্যা।

১৫. কাম রাগানুশয়, ভব রাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, মানানুশয়, দৃষ্টানুশয়, বিচিকিৎসানুশয় ও অবিদ্যানুশয়।

১৬. কাম, ভব, প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, শীলব্রত পরমর্শ, বিচিকিৎসা, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য ও অবিদ্যা সংযোজন।

১৭. লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, অহ্রী ও অনপত্রপা ক্লেশ।

পর্যন্ত যে সময় বুদ্ধ জীবিত ছিলেন সে সময়কে স-উপাদিশেষ নির্বাণ বলে ।

২. অনুপাদিশেষ নির্বাণ যখন কুশীনগরের মহাশাল বৃক্ষ বনে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন (অতীত বিপাক পঞ্চস্কন্ধের অবিদ্যমানতা বা পুনরুৎপত্তি সম্পূর্ণ নিরোধাবস্থা) তখন ইহাকে “অনুপাদিশেষ নির্বাণ” বলে ।

আকার ভেদানুসারে নির্বাণ তিন প্রকার । যথাঃ

(ক) শূন্যতা নির্বাণ - লোভ, দ্বেষ, মোহ ও ক্লেশ-কুলুষ শূন্যতা অথবা দুঃখ সত্য নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের পুনরুৎপত্তির সমুদয় সত্যের নিঃশেষ বা শূন্যতাকেই “শূন্যতা নির্বাণ” বলে ।

(খ) অনিমিত্ত নির্বাণ - দুঃখ সমুদয় সত্য তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম-ভব, অবিদ্যা ও সংস্কারের নিমিত্ত হীনতাকেই “অনিমিত্ত নির্বাণ” বলে ।

(গ) অপ্রাণিহিত নির্বাণ - সর্ব সংস্কার, স্কন্ধ ও ত্রি-লোকে পুনরুৎপত্তির প্রতি আসক্তিহীনতা, বিগত তৃষ্ণা ও বিরাগতাকেই “অপ্রাণিহিত নির্বাণ” নামে অভিহিত করা হয় ।

শ্রদ্ধাবান সাধকগণ, নির্বাণ বিষয়ে আরো স্বচ্ছ ধারণার জন্য রাজা মিলিন্দ ও নাগসেন ভাণ্ডের নির্বাণ নিয়ে প্রশ্নোত্তরের উক্তি দু’টি নিম্নে উল্লেখ করা হল -

নিরোধই নির্বাণ :

রাজা বলিলেন ভাণ্ডে! নিরোধই কি নির্বাণ?

হ্যাঁ মহারাজ! নিরোধই নির্বাণ ।

ভাণ্ডে! ইহা কি প্রকারে?

মহারাজ! সমস্ত অজ্ঞ, পৃথকজন আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উপভোগে রত হয়, উহাকে অভিনন্দন করে, উহার প্রশংসা

করে এবং উহাতে নিমজ্জিত থাকে। তাহারা সেই স্রোতে ভাসিয়ে যায়। বার বার জন্ম গ্রহণ করে, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, মনস্তাপ হতে মুক্ত হয়না। আমি বলি, তাহারা দুঃখ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় না।

মহারাজ! পক্ষান্তরে জ্ঞানবান, আৰ্যশ্রাবক আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয় বিষয় সমূহতে উপভোগে রত হন না, তাহাকে অভিনন্দন করে না, প্রশংসা করেনা এবং উহাতে নিমজ্জিতও হয়না। তদ্ব্যতীত তাঁহার তৃষ্ণার নিরোধ হয়, তৃষ্ণা নিরোধের ফলে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদান নিরোধের ভব নিরোধ হয়, ভব নিরোধে জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিতাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও মনস্তাপ নিরোধ হয়। এভাবে তাঁহার যাবতীয় দুঃখ রাশি নিরোধ হয়ে থাকে।

মহারাজ! এভাবে নিরোধ হওয়াকেই ‘নির্বাণ’ বলে।

ভান্তে নাগসেন! আপনি দক্ষ।

নির্বাণ লাভ :

রাজা বলিলেন ভান্তে! সকল লোকই কি নির্বাণ লাভ করে?

না মহারাজ! সকলই নির্বাণ লাভ করে না, অথচ যে সম্যক্ রূপে ধর্ম পথে চলেন, জানিবার যোগ্য ধর্ম সমূহকে জানেন, গ্রহণতব্য বিষয় সমূহকে গ্রহণ করেন অনুশীলনীয় ধর্ম সমূহকে নিজের মধ্যে অনুশীলন করেন ও প্রত্যক্ষ করণীয় ধর্ম সমূহকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন, কেবল সেই নির্বাণ লাভ করে থাকেন।

ভান্তে নাগসেন! আপনিই দক্ষ।

“সমাপ্ত”

অত্র গ্রন্থ প্রকাশে যারা শ্রদ্ধাদান দিয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা

ক্র. নং	নাম ও ঠিকানা	শ্রদ্ধাদানের পরিমাণ
১.	সোয়েমা লিম্বু, মায়ানমার (ফ্রান্স প্রবাসী)	৩০,৯৪৯/-
২.	খুশী কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, অনিতা তঞ্চঙ্গ্যা, চিক্কা কারবারী পাড়া, বাঘমারা	১০,০০০/-
৩.	শান্তিলাল চাকমা, আনন্দ বিহার এলাকা, রাজামাটি	৫০০০/-
৪.	সুনন্দা তঞ্চঙ্গ্যা, বিজয়পাড়া, রোয়াংছড়ি	৫০০০/-
৫.	ঝর্ণা তঞ্চঙ্গ্যা, বিজয়পাড়া, রোয়াংছড়ি	১০০০/-
৬.	স্মৃতি তঞ্চঙ্গ্যা, বালাঘাটা, বান্দরবান	৫০০/-
৭.	মিতালী তঞ্চঙ্গ্যা, বিজয়পাড়া, রোয়াংছড়ি	৫০০/-
৮.	যতনবালা তঞ্চঙ্গ্যা, বিজয়পাড়া, রোয়াংছড়ি	১৩০/-
৯.	ঞাণাপাল শ্রামণ, বটতলী সর্বজনীন মৈত্রী বিহার, রোয়াংছড়ি	৫০০/-
১০.	বাইশখন তঞ্চঙ্গ্যা, দেবী তঞ্চঙ্গ্যা, চিক্কাপাড়া, বাগমারা	৬০০০/-
১১.	আনন্দ মুগী তঞ্চঙ্গ্যা, চিক্কাপাড়া, বাগমারা	১০০/-
১২.	কেশচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, সুবর্ণা তঞ্চঙ্গ্যা চিক্কাপাড়া, বাগমারা	২০০/-
১৩.	মিটন বড়ুয়া, বিনাজুরী	১০০০/-
১৪.	বিপ্লব বড়ুয়া, বিনাজুরী	৫০০/-
১৫.	বাসু বড়ুয়া, বিনাজুরী	৩০০০/-
১৬.	শুভদ্রিয় শ্রামণ, বনবিহার, রাজামাটি	৫০০০/-
১৭.	স্নেহ তঞ্চঙ্গ্যা, চিক্কাপাড়া, বাগমারা	২০০০/-